গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১০ - ১৬ এপ্রিল, ২০০৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

ক্ষমা চাওয়ার ভেক ধরেছে সিপিএম

সম্প্রতি সিপিএম সম্পাদক বিমান বসু নির্বাচনী সভাগুলিতে গিয়ে কর্মীদের নির্দেশ দিচ্ছেন, ''ভুল করে থাকলে মানুষের কাছে ক্ষমা চান।''

তিন দশকের বেশি সময় ধরে রাজ্য জুড়ে যারা হুমকি, অত্যাচার, খুন, ধর্ষণের অবাধ রাজত্ব কায়েম করেছে, সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ, দাবি-দাওয়া যারা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মুখে আজ ক্ষমা চাওয়ার কথা! ক'দিন আগেও মানুষকে যারা মানুষ বলে গণ্য করেনি, চূড়ান্ত ঔদ্ধত্যের সঙ্গে দলের যে সব হেভিওয়েট নেতাদের মুখে 'চার দিক ঘিরে লাইফ হেল করে দেব,' 'দেখে নেব, কার কত ক্ষমতা' প্রভৃতি ডায়লগ শোনা গেছে, সেইসব নেতারাই আজ কর্মীদের ভুলের জন্য ক্ষমা চাওয়ার কথা বলছেন।

আসলে লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে সর্বত্রই সাধারণ মানুষের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হচ্ছে সিপিএম কর্মীদের। তিন দশক সমস্ত অত্যাচার মুখ বুঝে সহ্য-করা মানুষ আজ সর্বত্রই মুখ খুলছে, সিপিএমের দুষ্কর্মের কৈফিয়ত দাবি করছে এবং তাদের বিরোধিতার কথা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে। তাতেই ভীত হয়ে পড়েছেন ভোটবাজ সিপিএম নেতারা। তাঁরা বুঝেছেন, চিরাচরিত ঔদ্ধত্য তাঁদের খাদের আরও কিনারায় ঠেলে দেবে। তাই তাঁরা স্থির করেছেন, ঔদ্ধত্য নয়, বিনয়ের ছদ্মবেশেই মানুষের কাছে যেতে হবে এবং ভোট চাইতে হবে। বিমান বসু বলেছেন, ''ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। কোনও ভুলের জন্য ত্রুটি স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে, বাংলার মানুষ ক্ষমা করে দেয়। এটা আমরা অতীতেও দেখেছি।'' ছলনায় সিদ্ধহস্ত অত্যন্ত চালাক দুষ্কৃতীরা যেমন মানুষের সদাশয়তাকে কাজে লাগাতে কৃত দুষ্কর্মের জন্য লোকদেখানো ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং পরে আরও অধিক ক্রূরতায় একই কাজ করে, তেমনই সিপিএম নেতারা মানুষের ক্ষমাশীলতাকেই কাজে লাগাতে চাইছেন। না হলে, গত তিন দশকে সিপিএম নেতারা কখনও কর্মীদের মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলেননি, বরং উল্টে নির্দেশই দিয়েছেন। আজ হঠাৎ তাঁরা ভুলের জন্য এমনভাবে ক্ষমা চাইতে বলছেন, যেন এসব নিছক কর্মীদের ভুল। কিন্তু এটা কি সত্য? নেতৃত্বের অগোচরে বা তাঁদের নির্দেশ ছাড়াই কি কর্মীরা সাধারণ মানুষের উপর বছরের পর বছর ধরে এই 'ভুল' করে গেছেন? খুন-ধর্ষণ-অত্যাচারের তাণ্ডব চালিয়ে গেছেন? নাকি এ তাঁদের গদিসর্বস্ব রাজনীতিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, ক্ষমতায় যাওয়ার পর অনুকূল পরিবেশে যা ক্রমেই প্রকট হয়েছে এবং যা তাঁরা বছরের পর বছর ধরে চর্চা করে আসছেন? সত্যিই সিপিএম নেতারা তাঁদের কৃত ভুলগুলির জন্য অনুতপ্ত হলে, কর্মীদের আগে তাঁদেরই মানুষের

ছয়ের পাতায় দেখুন

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের দুঃশাসনের খতিয়ান

কেন্দ্রে গত প্রায় পাঁচ বছর সিপিএমের সমর্থনেই চলেছে কংগ্রেস সরকার। পশ্চিমবঙ্গে তিন দশকেরও বেশি চলছে সিপিএম সরকারের একটানা শাসন। কেমন আছেন দেশের ও রাজ্যের মানুষ?

গ্রামোন্নয়নের ধাপ্পা

- ক্রয়ক্ষমতার অভাবে এদেশের ২৫ কোটি নারী-পুরুষ-শিশু ক্ষুধার্ত অবস্থাতেই রাতে ঘুমোতে যায়। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুধার্ত ৮৮টি দেশের মধ্যে ভারত ৬৬ নম্বরে। ভারতীয় জনসংখ্যার শতকরা ৭৭ জন 'দরিদ্র ও অসহায়' অবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যাদের দৈনিক আয় ২০ টাকারও কম। এঁদের মধ্যে এমন মানুষও আছেন যাঁদের দৈনিক আয় ৯ টাকারও কম।
- পশ্চিমবঙ্গের ৪৬১২টি গ্রাম 'গরিবের চেয়ে গরিব', যেখানে বছরের তিন মাস অনাহারে কাটে মানুষের। রাজ্য সরকার নিজেই গ্রাম বাংলায় সমীক্ষা চালিয়ে একথা ঘোষণা করেছে। গ্রামবাংলার শতকরা ৩৪টি পরিবারের দৈনিক ১০ টাকা খরচেরও ক্ষমতা নেই। রাজ্যে কৃষক কমছে। বাড়ছে প্রান্তিক মজুর, খেতমজুর।

ঋণের ফাঁদে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে, সরকার দর্শক

- ১৯৯৮-২০০৩ — পাঁচ বছরে দেশে চাষির আত্মহত্যা এক লক্ষেরও বেশি।
- পশ্চিমবঙ্গে ঋণের ফাঁদে পড়ে চাষির আত্মঘাতী হওয়ার কথা সরকার স্বীকার করে না। তদ্‌সত্ত্বেও গত ২০০২ সাল থেকে এ পর্যন্ত ২৬ জন কৃষকের আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ খবরের কাগজে স্বীকার করা হয়েছে।

কর্মসংস্থান নেই, কল-কারখানা বন্ধ করে লক্ষ লক্ষ ছাঁটাই

- ২০০৭-০৮ সালে সমগ্র ভারতে নথিভুক্ত বেকার ৪ কোটি ১৪ লক্ষ। কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের পাঁচ বছরে নথিভুক্ত বেকার বেড়েছে ৫ লক্ষ। কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরে শূন্যপদের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ২৯৯।
- পশ্চিমবঙ্গে ২০০৮ সালে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা পৌঁছেছে ৫৯ লক্ষ ৭২ হাজারে। '০৭ সালের বেকার তালিকা থেকে সরকার ২০ লক্ষ নাম কেটে বাদ দিয়ে বেকার সংখ্যা কমিয়েছে। গত এক বছরেই নথিভুক্ত বেকার বেড়েছে ২,৭০,৯৯৪ জন। ২০০১-০৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে কাজ হারিয়েছে ১২ লক্ষ ০৬ হাজার ৮৬ জন শ্রমিক, কিন্তু কাজ পেয়েছে মাত্র ২৫ হাজার ১৪৯ জন, তাও অস্থায়ী ও ঠিকা মিলিয়ে। ২০০৪-০৬ কাজ হারিয়েছে ৪ লক্ষ ২৪ হাজার জন, কাজ পেয়েছে মাত্র ৮৪ হাজার। ২০০৭-০৮ সালে কর্মচ্যুতির সংখ্যা আরও ভয়ঙ্কর।

নবজাতকদের ঘাড়ে ঋণের বোঝা

- ১১০ কোটি ভারতবাসীর মাথাপিছু শুধু বৈদেশিক ঋণ ৮, ৬৪৭ টাকা। এর সঙ্গে দেশের ভিতরে বিভিন্ন কোম্পানির কাছে করা সরকারি ঋণের বোঝা তো আছেই। ২০০৭-০৮ সালে ভারতবর্ষের বিদেশি ঋণ বেড়েছে গত বছরের তুলনায় ৩০.৪ শতাংশ। মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ১২১ কোটি ডলার।
- ভয়াবহ ঋণের ফাঁদে পশ্চিমবঙ্গও। প্রায় সাড়ে আট কোটি বঙ্গবাসীর ঘাড়ে মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ১৬,৯০৭ টাকা। রাজ্যের এ পর্যন্ত পরিশোধযোগ্য মোট ঋণ ১,৪৩,৭১৬ কোটি টাকা।

রাজ্যে ভূমিহীন বাড়ছে

১৯৯১ জনগণনা অনুসারে ভূমিহীন ৫৪,৮১,৫৪৮ জন।
২০০১ শেষ জনগণনা অনুযায়ী ভূমিহীন ৭৩,৬২,৯৫৭ জন।

রাজ্যে গ্রামীণ মজুর বাড়ছে

১৯৯১ জনগণনা অনুসারে গ্রামীণ মজুর ১৩,৩৩,৭৭৬ জন।
২০০১ শেষ জনগণনা অনুসারে গ্রামীণ মজুর ৬৪,৩৯,৪৭২ জন।

কমছে চাষি

১৯৯১ — ৬৪,০৭,৩৪৯ | ২০০১ — ৫৬,১৩,১১৩

এস ইউ সি আই প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার মিছিল

২ এপ্রিল ক্যানিং বাজারে প্রখর রৌদ্রের মধ্যে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ তরুণ মণ্ডলকে নিয়ে জনগণের মিছিল। রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আই নেতৃবৃন্দ

মুখে মার্কিনবিরোধী বুকনি
তলে তলে ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে সিপিএম

মুখে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তেই তলে তলে সিপিএম মার্কিন-দালাল ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে। মার্কিন মদতে প্যালেস্টাইনের গাজায় ইজরায়েল যখন বর্বর আক্রমণ চালাচ্ছে, যার বিরুদ্ধে গোটা দুনিয়া সোচ্চার; সিপিএম যখন দিল্লি থেকে দাবি তুলছে, ভারত সরকারকে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, তখনই গত বছরের জুলাই মাসে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত মার্ক শোফার কলকাতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কলকাতা কর্পোরেশনের সিপিএম মেয়র বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন।

পুঁজির গায়ে যে শ্রমিকের রক্তের ছাপ লেগে থাকে — মার্কসবাদের এই গোড়ার পাঠটাকেই বাদ দিয়েছেন সিপিএম নেতারা। তাঁরা বুঝেছেন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়ের বালাই বাদ না দিলে গদি নিংড়ে মধু খাওয়া যাবে না। তাই ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট হন্তারক সুহার্তোর সুহৃদ সালিম এখন সিপিএমের বন্ধু। গাজা ভূখণ্ডে নিষিদ্ধ বিষাক্ত ফসফরাস যুক্ত অস্ত্র ব্যবহারকারী ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত মুখ্যমন্ত্রীর খানাপিনার সঙ্গী।

সারা দুনিয়ায় ধিক্কৃত মার্কিন দালাল ইজরায়েল ভারতে পা রাখতে চায়। সেই চরণধূলি আনতে ২০০০ সালে প্রথম ভারত থেকে ইজরায়েল যান জ্যোতি বসু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পঁচিশ জন পুঁজিমালিক। ভারত সরকার সরাসরি ইজরায়েল যেতে চাইছিল না। কারণ ইজরায়েলের শত্রু আরব দেশগুলিতে ভারতের বাণিজ্য বিরাট।

কেন্দ্রে তখন বিজেপি সরকার। তারা ভারতের বিদেশনীতির মুখ ঘোরাতে চায় আমেরিকার দিকে। ফলে জ্যোতি বসু গেলেন ইজরায়েল, সকলে

সাতের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের চাপে রাজগাঁও স্টোন কোম্পানিতে সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক প্রত্যাহার

শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বি-ফর্ম চালু, অস্থায়ী শ্রমিকদের হাজিরা খাতা চালু, দূষণরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, চালু মেশিনে বোলডার কমিয়ে বাইরের কোম্পানিকে বোলডার বিক্রি বন্ধ করা ও মজুরি বৃদ্ধি সহ ১২ দফা দাবিতে ১২ মার্চ আন্দোলন শুরু হলে কাশিমবাজার মহারাজার মালিকানাধীন রাজগাঁও স্টোন কোং প্রাঃ লিঃ কর্তৃপক্ষ গোপালপুর কোয়ারিজের সমস্ত কাজ ১৩ মার্চ আচমকা বন্ধ করে দেয়। এর ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ৫০০০ জন শ্রমিক কাজ হারান। ১৪ মার্চ সকালে কাজে যোগ দিতে এসে কারখানা বন্ধের নোটিশ দেখে উপস্থিত কয়েক হাজার শ্রমিক ক্ষোভে ফেটে পড়েন। অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত একমাত্র স্বীকৃত রাজগাঁও স্টোন কোং লেবার ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসানের নেতৃত্বে সহস্রাধিক শ্রমিক ঐদিন বেআইনি ওয়ার্ক সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়ার দাবিতে বিশাল মিছিল করে ম্যানেজমেন্ট অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ঐদিনই এলইও (সি), এএলসি(সি), আরএলসি(সি), এসডিও, বিডিও, ম্যানেজমেন্ট অফিস সর্বত্র চিঠি পাঠিয়ে বেআইনি নোটিশ প্রত্যাহারে কার্যকরী ভূমিকা নিতে আবেদন জানানো হয়। ১৭ মার্চ কারখানায় বিরাট প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা এবং ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসান। ক্রমবর্ধমান আন্দোলনের চাপে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৫ মার্চ মুরারই ব্লক অফিসে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ মার্চ এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা ও ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড রফিকুল হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ শতাধিক শ্রমিক মুরারই বাজারে মিছিল করে ব্লক অফিসের বৈঠকে যোগ দিতে এসে দেখেন, সেখানে মালিকের মদতপুষ্ট কাগুজে ইউনিয়ন সিটুকে ডাকা হয়েছে। শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়লে সিটুকে বাদ দিয়ে একমাত্র স্বীকৃত ইউনিয়ন রাজগাঁও স্টোন কোং লেবার ইউনিয়নের সাথে মানেজমেন্ট বৈঠক করতে বাধ্য হয় এবং বেআইনি সাসপেনশন অব ওয়ার্ক তুলে নিতে সম্মত হয় ও ইউনিয়ন উত্থাপিত দাবিগুলি মীমাংসার আশ্বাস দেয়। ১২ দিন বন্ধ থাকাকালীন সমস্ত শ্রমিককে মজুরি দেওয়ার দাবিও আলোচনার চুক্তিতে নথিভুক্ত করা হয়।

২৬ মার্চ থেকে কারখানার সমস্ত বিভাগের কাজ চালু হয়েছে।

পূর্ব মেদিনীপুরে অ্যাবেকার সম্মেলন

ব্লকে ব্লকে ৩৩/১১ কেভি সাব স্টেশন দ্রুত গড়ে তোলা, গ্রাহক পরিষেবার সুবিধার্থে কাঁথি সাপ্লাইকে ভাগ করা, গ্রাহককে মিটার কেনার অধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া, লোডশেডিং-লো ভোল্টেজ বন্ধ করা, কৃষিতে ৩ একর পর্যন্ত জমির মালিকদের বিনা পয়সায়, বাকিদের ৫০ পয়সা ও গৃহস্থ-ক্ষুদ্রশিল্প-ক্ষুদ্র ব্যবসায় ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়া, চাষ চলাকালীন ট্রান্সফরমার খারাপ হলে বা পুড়ে গেলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাল্টে দেওয়া এবং হরিপুরে পরমাণু প্রকল্প বাতিল সহ একগুচ্ছ দাবিতে ২১ মার্চ কাঁথি জনমঙ্গল সমবায় সমিতি হলে অ্যাবেকার কাঁথি শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাস ও উদ্বোধক ছিলেন কাঁথি পৌরসভার পৌরপ্রধান বিধায়ক শিশির অধিকারী। সঞ্জিত বিশ্বাস বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মাশুলবৃদ্ধি সহ নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনায় বলেন, বিদ্যুৎ পরিষেবার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণই হচ্ছে এর মূল কারণ, যা ২০০৩ বিদ্যুৎ আইন ও রাজ্যের ২০০৭ সংশোধনীর মাধ্যমে এ'রাজ্যে সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। তিনি ২০০৩ বিদ্যুৎ আইন বাতিলের দাবিতে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। শিশির অধিকারী, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের দাবিগুলি যাতে পূরণ হয় তার জন্য সচেষ্ট হবেন বলে আশ্বাস দেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন অ্যাবেকার রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোকতরু প্রধান, কাউন্সিলর সুবল মান্না সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অশোক প্রধান। প্রতিনিধি সম্মেলনে কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্প গ্রাহকরা তাঁদের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভাশেষে অরুণাংশু পাত্রকে সভাপতি, সুশান্ত জানাকে সম্পাদক ও কল্পনা দাসকে কোষাধ্যক্ষ করে ৩৫ জনের একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়।

১৫ই মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ছোটখেলনা হাইস্কুলে অ্যাবেকা পিংলা থানা সম্মেলন হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক অনুকূল ভদ্র। সহসভাপতি অমল মাইতি, জেলা সম্পাদক মধুসূদন মান্না, থানা সম্পাদক কালিপদ দিন্ডা প্রমুখ।

অ্যাবেকার ডাকে হুগলি সার্কেল ম্যানেজার ঘেরাও

অবিলম্বে লোডশেডিং বন্ধ করা, কৃষিবিদ্যুতের বিল সংশোধন এবং বিদ্যুতায়নের দাবিতে ১৯ মার্চ অ্যাবেকার ডাকে পাঁচ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক মিছিল করে চুঁচুড়ায় হুগলি সার্কেল ম্যানেজারের অফিস ঘেরাও করে। ম্যানেজার অফিসে না থাকায় গ্রাহকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং গোটা অফিস কার্যত বিক্ষোভকারীদের দখলে চলে যায়। শেষপর্যন্ত নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপে সার্কেল ম্যানেজার তাঁর ঘরে ঢুকতে পারেন। সেখানে তিনি জেলা সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরী এবং সহ সম্পাদক মণিমোহন ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁকে ১৪ দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সার্কেল ম্যানেজার দাবিগুলি যুক্তিযুক্ত বলে স্বীকার করেন এবং সমস্যাগুলি নিষ্পত্তির প্রতিশ্রুতি দেন।

পিটিটিআই ছাত্রদের আন্দোলন চলবে

গত ৩ এপ্রিল ডব্লিউ বি পি টি টি এস ইউ-এর এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে খুবই সন্তুষ্ট বা আপাতত আর কোনও আন্দোলন নয় বলে যে সংবাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে পরিবেশিত হয়েছে, সে সম্পর্কে সংগঠন ৫ এপ্রিল এক প্রেস বিবৃতিতে তার প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করেছে।

তারা জানিয়েছে, রাজ্য সরকার জেনেশুনে এবং প্রকৃত তথ্য গোপন করে অবৈধ কোর্সে ভর্তি করে হাজার হাজার পিটিটি ছাত্রছাত্রীদের সাথে প্রতারণা করেছে, বছরের পর বছর হাইকোর্টে মামলা জিইয়ে রেখেছে, জেলায় জেলায় ছাত্রদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে, নয়টি তাজা প্রাণকে আত্মাহুতি দিতে বাধ্য করেছে। সিঙ্গুরের জমি হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তি মাননীয় রাজ্যপালের উপস্থিতিতে হওয়া সত্ত্বেও যারা তা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়, এহেন রাজ্য সরকারের নির্বাচনের মুখে প্রকাশ করা সহানুভূতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস তাদের নেই। তাই বৈধ ডিগ্রিধারী ও প্রতিটি পিটিটি ছাত্রের চাকরির দাবিতে আন্দোলন চলবে।

কমরেড সাজেম আলি স্মরণসভা

২৩ মার্চ এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক কমরেড সাজেম আলির স্মরণসভা বহরমপুর গ্রাণ্ট হলে অনুষ্ঠিত হয়। পার্টির জেলা কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড আব্দুস সঈদ সভাপতিত্ব করেন।

উল্লেখ্য, ১৩ মার্চ কমরেড সাজেম আলি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সন্তানতুল্য কমরেডদের এবং বর্তমান লালবাগ লোকাল কমিটির সম্পাদিকা স্ত্রী গুলসেনারা ইভা ও কন্যা মিলিয়ার প্রতি তাঁর আন্তরিক আবেদন ছিল, তাঁরা যেন এস ইউ সি আই পার্টিটা ভাল করে করেন। প্রধান বক্তা জেলা সম্পাদক কমরেড স্বপন ঘোষাল প্রয়াত সাজেম আলির সর্বশেষ আকুতিগুলো স্মরণসভায় তুলে ধরেন।

সভার সূচনায় প্রয়াত কমরেড সাজেম আলির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন জেলার বিভিন্ন ইউনিট থেকে আগত লোকাল সম্পাদক ও ইনচার্জরা এবং গণসংগঠনের দায়িত্বশীল কমরেডরা। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীতটি পরিবেশিত হয়। কমরেড সাজেম আলি স্মরণে শোক প্রস্তাবটি পাঠ করেন রাজ্যের বিশিষ্ট কৃষকনেতা এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মদন সরকার। প্রয়াত কমরেডের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

হলদিয়া ডক ইনস্টিটিউটের নির্বাচনে সিপিএমের শোচনীয় পরাজয়

২৭ মার্চ হলদিয়া ডক ইনস্টিটিউটের নির্বাচনে সিপিএমের শ্রমিক সংগঠন সি আই টি ইউ এবং সিপিআই-এর শ্রমিক সংগঠন এ আই টি ইউ সি সম্মিলিতভাবে কলকাতা পোর্ট শ্রমিক ইউনিয়ন এবং এন ইউ ডব্লিউ ডব্লিউ শ্রমিক সংগঠনের কাছে মোট ১৯টি আসনের মধ্যে ১৮টি আসনে পরাজিত হয়েছে। একমাত্র জয়ী সি আই টি ইউ নেতা এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক সুকুমার দাস মাত্র ৫ ভোটের ব্যবধানে ক্রমানুযায়ী ১৮তম সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। সহ-সভাপতি পদে অর্ধেন্দু শেখর গাঁতাইত ৩০৫ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন এবং বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক কমরেড দীপক কুমার ওঝা ও কমরেড তাপস কুমার চক্রবর্তী যথাক্রমে ২৬৫ এবং ১৫৪ ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হয়েছেন।

হলদিয়া ডক ইনস্টিটিউট হলদিয়া বন্দরের স্থায়ী শ্রমিক-কর্মচারী-অফিসার ও তাঁদের পরিবারবর্গের শিক্ষা, বিনোদন, খেলাধূলা ইত্যাদি বন্দরের অর্থানুকূল্যে আয়োজন করে থাকে। প্রতি দু'বছর অন্তর এই ইনস্টিটিউটের পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। ২০০৭ সালে ইনস্টিটিউট নির্বাচনে প্রথমবার সিপিএম বিরোধীরা ক্ষমতায় আসে এবং সাফল্যের সাথে দু'বছর ইনস্টিটিউট পরিচালনা করে। এই সাফল্য এবং নন্দীগ্রাম কাণ্ড, নয়াচরে কেমিক্যাল হাব ও হলদিয়ায় সিপিএম নেতা-কর্মীদের আচার-আচরণের প্রতি সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারী এবং অফিসারদের বিরুদ্ধ মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে এই নির্বাচনে — জানান সিপিএসইউ সহ-সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফণীভূষণ চক্রবর্তী। সিপিএসইউ-র মধ্যে এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থকরা থাকার ফলে এটি সংগ্রামী শ্রমিক ইউনিয়ন বলে বন্দর শ্রমিক-কর্মচারীরা মনে করেন।

দীর্ঘ ২০ বছর কলকাতা-হলদিয়া পোর্ট অ্যান্ড ডক্ ওয়ার্কার্স ফোরামের মুখপত্র 'বন্দর সমাচার'-এর মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনমুখী মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করছে অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি। কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেওয়ায় ফোরামের সম্পাদক কমরেড অচিন্ত্য সিন্‌হা তাঁদের অভিনন্দন জানান এবং বন্দর শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে নবনির্বাচিত সদস্যদের যত্নবান হওয়ার জন্য আবেদন জানান।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে র‍্যাগিংয়ে নেতৃত্ব দিল এস এফ আই

২২ মার্চ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীদের, বিশেষ করে মেয়েদের উপর এস এফ আই কর্মীদের কুৎসিত র‍্যাগিংয়ের প্রতিবাদ করায় প্রহৃত হতে হল ডিএসও ছাত্রদের।

এদিন নবীনবরণ অনুষ্ঠানের নামে ছাত্রছাত্রীদের মঞ্চে ডেকে নানা অশ্লীল আচরণ ও অঙ্গভঙ্গি করতে বাধ্য করছিল এস এফ আই-এর সিনিয়র ছাত্ররা। রাজি না হলে তাদের ভয় দেখানো হচ্ছিল। এই জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে ডি এস ও-র নেতৃত্বে ছাত্রছাত্রীরা রুখে দাঁড়ালে এস এফ আই নেতারা তাদের উপর হামলা চালায়। আহত হয় অবধেশ ভক্ত, তুষারকান্তি সরকার, পঙ্কজ মণ্ডল, চন্দন শীট, মিন্টু ধীবর ও সুদীপকুমার জানা — এই ছয় ডি এস ও ছাত্র। এরপর সিপিএমের কয়েকজন দুষ্কৃতী ডি এস ও ছাত্রছাত্রীদের 'লাশ ফেলে দেবো' বলে হুমকি দেয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সংগঠনের পক্ষ থেকে এস এফ আই গুণ্ডাদের নাম দিয়ে তাদের শাস্তির দাবিতে স্থানীয় মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় এবং কলেজের ডিনকে সমস্ত ঘটনা জানানো হয়। অবিলম্বে র‍্যাগিং বন্ধ এবং দোষীদের শাস্তি না হলে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে কলেজ ইউনিটের সম্পাদক জানান।

রিষড়ায় আঞ্চলিক বিদ্যুৎগ্রাহক সম্মেলন

২২ মার্চ লোডশেডিং ও লো-ভোল্টেজ বন্ধ, গ্রাহকদের মিটার কিনে নেওয়ার অধিকার, মিটার ভাড়া ও ফিক্সড চার্জ বন্ধের দাবিতে হুগলির রিষড়া মোড়পুকুর-কানাইপুর শাখার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন চণ্ডী গাঙ্গুলী। সম্মেলনে মহিলা গ্রাহকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

সভায় মূল প্রস্তাব ও সম্পাদকীয় বক্তব্য পেশ করেন শাখা সম্পাদক সিতাংশুরঞ্জন তপাদার। মূল প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অপর্ণা ঘোষ, দীপালি পাল, সমীরণ বোস ও শ্যামল দাস।

প্রধান বক্তা ছিলেন মণিমোহন ঘোষ ও স্বপন দাস। নির্মল নারায়ণ ভট্টাচার্যকে সভাপতি ও সমরচন্দ্র দাসকে সম্পাদক করে মোট ১২ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়।

কর্মসংস্থানের নামে প্রতারণা

লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই শিল্পস্থাপনের স্লোগান তুলে হইচই ফেলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা এবং লক্ষ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি বিলোচ্ছেন। সর্বশেষ তাঁদের ঘোষণা — নয়াচরের কেমিক্যাল হাবে ১০ লক্ষ ১২ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। ঠিক এমনি করেই '৮০-র দশকের গোড়ায় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল্স-এ এক লক্ষ বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি শুনিয়েছিল জ্যোতি বসুর সিপিএম সরকার। সেই স্লোগানে চাগিয়ে তুলে লক্ষ লক্ষ বেকারকে তারা সল্টলেক থেকে হলদিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ পদযাত্রায় সামিলও করিয়েছিল। কী হয়েছে তার পরিণাম? লক্ষ বেকারের কাজ পাওয়ার যে স্বপ্ন দেখিয়েছিল সরকার, সেই স্বপ্ন কি সফল হয়েছে? বিধানসভায় এস ইউ সি আই বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলেছিলেন, সেখানে চাকরি পেয়েছেন এক লক্ষ নয়, এক হাজার জনও নয়, মাত্র ৬০০ জন।

বেকারদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটের বাক্স ভরানোর লক্ষ্যে এবারও সরকার নয়াচরে কর্মসংস্থানের ফানুস ওড়াচ্ছে। জল-জঙ্গল-নদী-মাছ- পরিবেশ সবকিছু ভয়ঙ্করভাবে নষ্ট করার পরে সিপিএম সরকার যদি শেষ পর্যন্ত কেমিক্যাল হাব করেও, তবু সেখানে ১০ লক্ষ তো দূর অস্ত, ১০ হাজারেরও চাকরি হবে না। ইতিপূর্বে সিঙ্গুরে কৃষকদের উর্বর কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার অজুহাত হিসাবে তারা ৬ হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের গল্প প্রচার করেছিল। সেখান থেকে টাটা চলে যাওয়ায় বেকাররা বঞ্চিত হল বলে এখন নির্বাচনী সভাগুলিতে চোখের জল ফেলছেন নেতা-মন্ত্রীরা। কিন্তু তাঁদের এই প্রচার আজ আর মানুষ বিশ্বাস করে না। সিঙ্গুরের কৃষক এবং খেতমজুররাও তাঁদের কথা বিশ্বাস করেননি। নন্দীগ্রামের মানুষও তাঁদের বিপুল কর্মসংস্থানের ধাপ্পায় বিন্দুমাত্র বিভ্রান্ত হননি।

চাকরি দিয়ে নয়, বেকারের নাম খাতা থেকে কেটে রাজ্যের বেকার সংখ্যা কমাচ্ছে সরকার

পশ্চিমবাংলায় বেকার সংখ্যা এখন কত লক্ষ? সরকারি হিসাবের বাইরে থাকা বিপুল বেকার সংখ্যার হিসাব বাদ দিয়ে শুধু নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যাই যদি ধরা হয়, তবে সাম্প্রতিক সরকারি আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০০৮ সালে এই সংখ্যা পৌঁছেছে ৫৯ লক্ষ ৭২ হাজারে। স্বীকার করা হয়েছে, এক বছরেই রাজ্যে নথিভুক্ত বেকার বেড়েছে আড়াই লক্ষেরও বেশি। নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা আরও ২০ লক্ষ বেশি হত, যদি সরকার বেকার সংখ্যা কমানোর অভিনব প্রক্রিয়াটি গ্রহণ না করত। কী প্রক্রিয়া? রাজ্যের কর্মসংস্থান অধিকর্তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বেকার সংখ্যা ছিল ৭৭ লক্ষ ২ হাজার। তাছাড়া, প্রতি বছরই সরকারের খাতায় বিপুল সংখ্যায় নতুন বেকার নাম লেখাচ্ছে। অথচ ২০০৭-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা কমে ৫৭ লক্ষ ২১ হাজার ১৬ জন হয়েছে — এ কথা বিধানসভায় জানিয়েছিলেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী, ২০০৮-এর ১২ মার্চ। তবে কি এক বছরে ২০ লক্ষ বেকারকে সরকার চাকরি দিল? মন্ত্রী জানালেন, না, এদের চাকরি দেওয়া হয়নি; চাকরির বয়স পেরিয়ে যাওয়ার জন্য বা কার্ড নবীকরণ না করার জন্য ২০ লক্ষ নাম কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে দারুণ ব্যাপার! যেন চাকরির বয়স পেরিয়ে গেলেই মানুষের বেকারত্ব ঘুচে যায়!

বেকারের সংখ্যা কমানোর এই চমৎকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে সিপিএম সরকার! কিন্তু, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা তো করতে হবে। সেটা কি সরকার করছে?

ন্যাশনাল লেবার সার্ভের রিপোর্ট অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ২০০১ সালে কাজ হারিয়েছেন ৩ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৬ জন, কাজ পেয়েছেন মাত্র ১৬ হাজার ২৯ জন। ২০০৩ সালে নতুন কারখানা হয়েছে ২৩৮টি, অথচ কারখানা বন্ধ হয়েছে ৪৩২টি। এই বছরে কাজ পেয়েছেন ৯ হাজার ১২০ জন, কিন্তু কাজ হারিয়েছেন ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার জন শ্রমিক। পরবর্তী বছরগুলিতে পরিস্থিতি ক্রমশ আরও খারাপ হয়েছে। উপরন্তু রাজ্য সরকার নিজেই সরকারি সংস্থাগুলিতে কর্মী ছাঁটাই করেছে ডিএফআইডি, এডিবি প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী অর্থলগ্নিকারী সংস্থাগুলি থেকে ঋণ নেওয়ার শর্ত হিসাবে। ২০০৩-০৪ সালে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থাগুলির থেকে ৯ হাজার ৯৪৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীকে ছাঁটাই করেছে। ২০০৬-০৭ সালে ২৯টি সংস্থায় ছাঁটাইয়ের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮০ হাজার। সিপিএম রাজত্বে এ পর্যন্ত বন্ধ প্রায় ৬৫ হাজার শিল্প-কারখানার লক্ষ লক্ষ কর্মহারা শ্রমিকের হাহাকার পশ্চিমবঙ্গের আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তুলেছে। কর্মহীন অনাহারী বহু শ্রমিকের আত্মহত্যা সরকারের শিল্পায়নের প্রচারকে চরম মিথ্যাচার বলে প্রমাণ করে দিয়েছে।

জনগণের ট্যাক্সের বিপুল অর্থ ব্যয় করে রাজ্য সরকার সংবাদপত্রে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন, টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে প্রচার, রাস্তায় বড় বড় হোর্ডিং দিয়ে রাজ্যে শিল্পায়নের বন্যা বইয়ে দেওয়ার যে ঢালাও প্রচার করেছে — এখন সেগুলি তাদেরই ব্যঙ্গ করছে। বেকার তরুণ-তরুণীদের উদ্দেশে সরকার বলেছিল, সল্টলেকের সেক্টর ফাইভ-এ তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সেই প্রচারের বেলুন এখন চুপসে গিয়েছে। সরকারের গর্বের সেই শিল্পে ছাঁটাই শুরু হয়েছে। আতঙ্কে ভুগছে কর্মরত তরুণ-তরুণীরা।

বছরে বেকার বাড়ছে আড়াই লক্ষের বেশি

২০০৩ নথিভুক্ত	৬৭,১৬,৪১৪
২০০৪	৬৯,৯২,৬৫২
২০০৬	৭৭,২০,১৯৮
২০০৭	৫৭,২১,০১৬
২০০৮	৫৯,৭২,০০০

আর কলমের খোঁচায় ১৯,৯৯,১৮২ জনের নাম কেটে দিল সিপিএম।

দি স্টেটসম্যান ৩.৬.০৮

এখন সরকারের নয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির হয়েছে — 'উদীয়মান স্বেচ্ছা কর্মসংস্থান প্রকল্প'। পূর্বের ঘোষিত 'বেকারভাতা', 'স্বনিযুক্তি প্রকল্প', বা 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' নিয়ে তারা এখন আর উচ্চবাচ্য করছে না। কারণ, সেগুলির স্বরূপ রাজ্যবাসীর কাছে ফাঁস হয়ে গিয়েছে।

বেকারভাতার চমক এখন বন্ধ

ক্ষমতায় বসে সিপিএম সরকার বেকারদের জন্য বেকারভাতা প্রকল্প চালু করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিল। এই প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে তারা চাকুরিরত মানুষদের উপর চাপিয়েছিল বৃত্তিকর। বেকারভাতা দেওয়া বন্ধ করে দিলেও কোটি কোটি টাকা বৃত্তিকর আদায় আজও চলছে। সেই অর্থ কোথায় যাচ্ছে — তা বৃত্তিকরদাতা জনগণকে জানানোর বিন্দুমাত্র প্রয়োজন অনুভব করছে না সরকার। সরকারের এই আচরণ কি জালিয়াতি নয়?

'স্বনিযুক্তি প্রকল্প' বেকারদের জেলে ও আত্মহত্যায় ঠেলেছে

'স্বনিযুক্তি প্রকল্প' ঘোষণা করে সরকার ঢাক-ঢোল পিটিয়ে প্রচার করেছিল, এই প্রকল্পের সাহায্যে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। স্বনিযুক্তি প্রকল্প চালু করার দাবি কোনওদিনই বামপন্থীদের দাবি ছিল না। এটা ছিল কংগ্রেসেরই লোকঠকানো কর্মসূচি। সেই লোকঠকানোর রাস্তাই নেয় সিপিএম। তারা বেকার তরুণ-তরুণীদের বলেছিল, যারা চাকরি পায়নি, তাদের মধ্যে যাদের পারিবারিক আয় মাসিক ২০০০ টাকা পর্যন্ত, তাদের জন্য বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করতেই এই স্বনিযুক্তি প্রকল্প। ব্যাঙ্ক থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা যাবে। তবে, এই প্রকল্পে ঋণ নিতে হলে বেকার তরুণ বা তরুণীকে তার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটি অবশ্যই সরকারের কাছে জমা দিতে হবে। সরকারি সাহায্য নিয়ে প্রকল্প গড়ে সে নিজেই নিজেকে সেখানে চাকরি দেবে বা নিযুক্ত করবে। সে কখনওই আর সরকারের কাছে চাকরির দাবি করতে পারবে না। রাজ্য শ্রম দফতরের ২০০৭ সালের 'লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল' পুস্তিকায় সরকার নিজেই পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়েছে, ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৬৯টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছিল সরকার। কিন্তু, এই প্রকল্পগুলি ঠিকমতো রূপায়িত হচ্ছে কি না, কিংবা প্রকল্প রূপায়ণে সমস্যায় পড়লে তরুণ-তরুণীদের কীভাবে সহায়তা দেওয়া যায়, তার জন্য কোনও কিছুই সরকার করেনি। বেকারদের থেকে শুধু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটি নিয়ে বেকার তালিকা থেকে নামগুলো ছেঁটে দিয়েই নিশ্চিন্ত থেকেছে এবং কর্মসংস্থান জোরকদমে চলছে বলে প্রচার করেছে। কিন্তু এই প্রকল্পে বেকারদের কর্মসংস্থান সত্যিই কতটা হয়েছে?

একদিকে বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা এবং অন্যদিকে সরকার ও প্রশাসনের চরম অবহেলার পরিণতিতে ঋণী বেকাররা প্রকল্প থেকে লাভ করে সংসার চালানো দূরের কথা, ব্যাঙ্কের ঋণটাই পরিশোধ করতে পারেননি। এরপর ঋণ পরিশোধের হুলিয়া জারি করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ পুলিশ নিয়ে তাঁদের তাড়া করে বেড়িয়েছে। ভদ্রঘরের শিক্ষিত সন্তানেরা যাঁরা পরিশ্রম করে অর্থোপার্জনের পথে ভালোভাবে বাঁচতে চেয়েছিলেন, সংসার প্রতিপালন করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা পুলিশের তাড়া খেয়ে অপরাধীর মতো পালিয়ে বেড়িয়েছেন, কেউ কেউ অপমানে আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছেন। অনেকের ঠাঁই হয়েছে জেলখানায়। বেকাররা বাঁচার জন্য সংঘবদ্ধ হয়ে গড়ে তুলেছেন 'স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতি'। সরকার ও প্রশাসনের নানা স্তরে আলোচনা, সভা-সমিতি করা ছাড়াও বিক্ষোভ করে বহু বেকারকে তাঁরা জেল থেকে মুক্ত করেছেন, বহু ক্ষেত্রেই পুলিশি হয়রানি বন্ধ করিয়েছেন। এখনও তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন।

'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পে'র নামে বশংবদদের পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা

২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে সরকারের যুবকল্যাণ দফতর ঘোষণা করেছিল, 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' (বি এস কে পি)। এই প্রকল্পের ৭০ শতাংশ ঋণ ব্যাঙ্কের, ২০ শতাংশ ঋণ রাজ্য সরকারের এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশ ঋণগ্রহীতার নিজের। ২০০০-০৪ সাল পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার প্রকল্পে ঋণ দেওয়া হবে বলে দফতর সাড়ম্বরে আগাম ঘোষণাও করেছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের ছাড়পত্র পেয়েছিল ঘোষণার প্রায় অর্ধেক — মাত্র ৬৩ হাজারটি। আবার, ব্যাঙ্কঋণ পেল তারও প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ — মাত্র ২৩ হাজার ৩২৪টি প্রকল্প। এগুলিতে ভরতুকি বাবদ সরকার দিয়েছিল ৬৯ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।

এ নিয়ে চতুর্দিকে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছিল। সরকারের যুব দফতরের প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ পায়, প্রকল্পের সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার বেকার তরুণ-তরুণীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ২০০৪ সালের অডিট রিপোর্টে বর্ধমান ও আসানসোলে খোঁজ পাওয়া গেল এমন ১০৮টি প্রকল্পের, যেগুলিতে সরকারি ভরতুকির পরিমাণ ছিল ৬৭ লক্ষ টাকা। দেখা গেল, এই প্রকল্পগুলির নাম করে সরকারি ভরতুকির সমস্ত টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছে এবং তার কোনও নথি সরকারি দফতরে নেই। ব্যাঙ্কের অফিসাররা প্রকল্পগুলির কোনও হদিস পায়নি। সাতটি জেলায় ৫৩৮টি সন্দেহজনক প্রকল্পের মধ্যে ৫১টির অনুসন্ধানেই অবস্থা যে কেমন শোচনীয় — তারও প্রমাণ মিলেছে।

শত শত ভুয়ো প্রকল্পের বাস্তব সম্ভাবনা প্রকাশ করে অডিট রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে যে, এই জালিয়াতির দরুন অন্ততপক্ষে ২০ কোটি টাকা উধাও হয়েছে। কোথায় লুঠ হয়ে গেল ঋণের ও ভরতুকির এত টাকা? সরকারি দল ও পুলিশ-প্রশাসনে দহরম-মহরম যাদের সবচেয়ে বেশি, তারাই যে এই বিপুল টাকা আত্মসাৎ করেছে — এই সত্য পশ্চিমবাংলার যে কোনও মানুষই বলে দিতে পারেন। বাস্তবে, নিজেদের বশংবদ এক দলকে পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্য থেকেই সিপিএম সরকারের যুব দফতর এই লুঠের ব্যবস্থা করেছিল। 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের' ফলে বাংলার বেকাররা 'স্বনির্ভর'ও হয়নি, বাংলার বেকারদের 'কর্মসংস্থানের' সমস্যাও মেটেনি; জনগণের টাকায় শাসকদলের কিছু বশংবদের পকেট ভরানো হয়েছে মাত্র। (তথ্যসূত্র ঃ বর্তমান, ২৬-১২-০৫)।

প্রতারণার নতুন টোপ

বেকারদের করুণ অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার মাঝেমধ্যেই যেসব প্রকল্প ঘোষণা করে চলেছে, সেগুলি প্রতারণাময়, বেকার ঠকানোর কূটকৌশল। সরকার ও শাসকদলের কাছে প্রতারণার নতুন চমক, নতুন প্রতিশ্রুতি জরুরি। মরিয়া সিপিএম সরকার তাই লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে ঘোষণা করেছে, 'উদীয়মান স্বেচ্ছা কর্মসংস্থান' প্রকল্প। এবার তারা বলছে, ২৫ হাজার নয়, ৫০ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে। ৫০ হাজার টাকা — শুনতে টাকাটা অনেক। কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার দাম এতটা কমেছে যে, আগের ২৫ হাজার টাকার জিনিসপত্র এখন ৫০ হাজার টাকাতেও আদৌ মিলবে কি না — এই প্রশ্নের জবাবটি কিন্তু সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছে সরকার।

সরকার জানিয়েছে, মাসিক পারিবারিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমাও এবার থাকছে না। এবার একাধিক বেকার যুবক মিলে মিনি 'কো-অপারেটিভ' স্টাইলে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারবে। ৫০ হাজার টাকার প্রকল্প হলে রাজ্য সরকার তাতে অনুদান দেবে ১২ হাজার ৫০০ টাকা। আর, ১০ জন যুবক যদি ৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প তৈরি করেন, তবে তাঁদের সরকার অনুদান দেবে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। বাকি টাকা দেবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক।

আগের তুলনায় আরও বেশি ক্ষেত্রে জুড়ে ছড়ানো হচ্ছে এই নতুন টোপ। সরকারের অনুদানের টাকা সহ প্রকল্পগুলির টাকা আবারও লুট হবে। প্রকল্পগুলি নিয়ে আবারও জালিয়াতির চূড়ান্ত হবে। সেগুলির নথিপত্র অফিসাররাও যথারীতি খুঁজে পাবেন না, ঠিক যেমনটি আগের প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে ঘটেছে। এই নতুন নামের প্রকল্প ঘোষণা যে বেকারদের প্রতি সরকারের দরদবোধ থেকে নয়, টোপ মাত্র — সেটা নিজেদের জীবনের এত বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝে নিতে মানুষের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। রাজ্যের মানুষের কাছে এই সরকারের বাস্তবে কোনও বিশ্বাসযোগ্যতাই আজ আর নেই। একদিকে বেকারদের প্রতারিত করা এবং অন্যদিকে ভরাডুবির আশঙ্কায় যারা সিপিএম ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত, তাদের ধরে রাখতে কিছু পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই নতুন টোপ। 'উদীয়মান স্বেচ্ছা কর্মসংস্থান প্রকল্প' রাজ্যের

পাঁচের পাতায় দেখুন

পুঁজিপতিদের 'ডোল' দেওয়ার আর্জি জানাল সিপিএম

এবার টাটা-হিন্দুজাদের 'ডোল' দেওয়ার আবেদন নিয়ে কেন্দ্রের কাছে হাজির হয়েছে সিপিএম। দলের পলিটব্যুরো সদস্য সীতারাম ইয়েচুরি টাটা মোটরস্ ও হিন্দুজাদের অশোক লেল্যান্ডের মতো অটোমোবাইল কোম্পানিগুলির জন্য ৩৮ হাজার কোটি টাকা প্রার্থনা করে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছেন। শ্রী ইয়েচুরি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভার সদস্য এবং পরিবহন সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান। মন্দায় বিপর্যস্ত গাড়ি শিল্পের ঘোর সংকটে শ্রীইয়েচুরি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। এবং সে কারণে তড়িঘড়ি এইসব কর্পোরেট হাউসকে রক্ষায় ৩৮ হাজার কোটি টাকা 'ডোল' মঞ্জুর করতে প্রণববাবুর কাছে আবেদন জানিয়েছেন (সূত্র ঃ বর্তমান, ৫-৩-২০০৯)।

সিপিএমের কাছে ৩৮ হাজার কোটি টাকা হয়ত অল্পই, যদিও গরিব চাষিদের জন্য, কিংবা কর্মহীন বেকারদের ক্ষুদ্র পরিসরে কর্মসংস্থানের জন্য এই 'অল্প' অর্থটুকু, বরাদ্দ করার কথা তাঁদের ভাবনায় আসে না। যত বেদনা শিল্পপতিদের বেলায়। শুধু অর্থ দিয়েই শেষ নয়, ইয়েচুরি প্রস্তাব দিয়েছেন, ঐ অর্থে গাড়ির শ্যাসি (chassis) তৈরি করার পর এঁদের বাজারও খুঁজতে হবে না, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিবহন সংস্থাই সব শ্যাসি কিনে নেবে। অনেকেই বলছেন, মুখ থুবড়ে পড়া অটোমোবাইল ব্যবসার স্বার্থেই ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি বাতিল করে দেওয়ার দাওয়াই চালু করা হচ্ছে। পরিবেশ কিংবা নিরাপত্তা হল অজুহাত মাত্র। তাহলে, এই যে শিল্পপতি বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে হাজার হাজার কোটি টাকা বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এসব কি কোনও নেতা বা মন্ত্রীর টাকা? এ তো জনসাধারণের রক্ত চোষা ট্যাক্সের টাকা! যথারীতি সরকার অর্থ সংকটের অজুহাত তুলে নতুন নতুন ট্যাক্স বসাবে, নয়ত শিক্ষা, স্বাস্থ্যে বরাদ্দ আরও কমাবে এবং দেদার ঋণ করবে।

যেমন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ বছর যে নতুন কর প্রকল্প প্রণয়ন করে ফেলেছে, তাতে জমির খাজনা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ শুল্ক বৃদ্ধি থেকে মদ বিক্রি বৃদ্ধি ইত্যাদি সিদ্ধান্ত হয়েছে। অজুহাত সেই একই। সরকারের তহবিলে টাকা নেই। এবার অজুহাতের এই ভাঙা রেকর্ডে যুক্ত হয়েছে পঞ্চম বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কর্মচারীদের বেতন প্রদানের বর্ধিত চাপ সামাল দেওয়া। মাত্র কয়েক মাস আগে সিঙ্গুরে টাটা কোম্পানিকে দান খয়রাত করার সময় এই কথাটা কিন্তু মনে হয়নি। ন্যানো প্রকল্প গুটিয়ে নিয়ে টাটা কোম্পানি চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে করে নিয়ে গেল কী কী? কত টাকা? জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকার দিয়েছে ১৩৪ কোটি টাকা। ২০০ কোটি টাকা ধার দিয়েছে সরকার, ২০ বছর কিছুই দিতে হবে না, ২১তম বছর থেকে ১ শতাংশ হারে সুদ দেবে মাত্র। অর্থাৎ, কার্যত এটা অনুদান। সমগ্র প্রকল্প নির্মাণ পর্বে বিদ্যুৎ পাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, রাস্তাঘাট নিখরচায়, জল নিকাশির ১২৭ কোটি টাকা। পুলিশ প্রহরা ইত্যাদির ব্যয় বিপুল পরিমাণ। এদিকে ৯০ বছরের লিজ নিয়ে টাটা বহাল তবিয়তে কৃষিজমি দখল করে বসে আছে এক পয়সাও ফেরতের প্রশ্ন তোলেনি রাজ্য সরকার। এদিকে কর্মচারীদের মাইনের প্রশ্নে নিরুপায়ের ভান করে হাজার হাজার কোটি টাকা কর চাপাচ্ছে দীন-দরিদ্র মানুষের উপর।

কী বিপুল পরিমাণ কর বসানোর পরিকল্পনা হয়েছে, তা বাজেট ছাড়া পরিষ্কার হবে না। যতটুকু ইতিমধ্যে সরকারিভাবে প্রকাশিত, তা আতঙ্কিত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। টাটাকে সিঙ্গুর প্রকল্পে বিদ্যুতের কোনও দামই দিতে হয়নি, রাজ্যবাসীর ঘাড়ে বাড়তি বিদ্যুৎ শুল্ক চাপছে। ১৩৪ কোটি টাকার জমির খাজনাতো দূরের কথা, ৫ বছর পর মাত্র ২০ কোটি টাকা দিয়ে শুরু করতে হত জমির দাম দেওয়া। এটা টাটার বেলায়, অপরদিকে আমার-আপনার বেলায় পৈতৃক জমির খাজনা বৃদ্ধি ঘটছে। উন্নয়নের কী অপার মহিমা!

টাটা-বিড়লা-হিন্দুজা-আম্বানি কিংবা বিদেশি পুঁজিপতি সালেমদের ঐটুকু সুযোগ না দিলে তাঁরা গোঁসা করে অন্যত্র চলে যাবেন। তাহলে এই পোড়া রাজ্যের কী দুর্দশাই না হবে! সিপিএমই খবর দিচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তুলনায় ঘনিষ্ঠতর শিল্পবন্ধু হওয়ায় টাটা মোটরসকে অনেক বেশি উপঢৌকন দিয়েছে মোদি সরকার। ১৩ নভেম্বর '০৮ গণশক্তি লিখছে, 'গুজরাট সরকার ৯,৫৭০ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে টাটাকে, যা শোধ করতে হবে ২১তম বছর থেকে। সে ঋণের সুদের হার মাত্র ০.১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের সিঙ্গুর থেকে যন্ত্রপাতি খুলে নেওয়ার জন্য আরও ৭০০ কোটি টাকাও সরকার দিচ্ছে বলে জানা গেছে। ...গুজরাটে ন্যানোকে ছাড় ৩০ হাজার কোটি টাকা!' এর পরেও কি সিপিএম বলবে, আন্দোলন করে বিরোধীরা সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে? নাকি লুটেরা টাটা যেখানে যা পায় লুটে নিচ্ছে, আর পরের ধনে দাতাকর্ণ হওয়ার প্রতিযোগিতায় বুদ্ধবাবুর সিপিএম সরকার বিজেপি'র নরেন্দ্র মোদির কাছে হেরে গেছে। এখন মালিকদের পরবর্তী উপঢৌকন দেবার রসদ সংগ্রহ করতে রাজ্যবাসীর উপর ট্যাক্সের বহর বিপুল পরিমাণ বাড়াচ্ছে।

বামফ্রন্ট সরকার বলতে পারে, নিরবচ্ছিন্ন ৩২ বছর তাদের শাসনে এ রাজ্যের উন্নয়ন ঘটেছে প্রভূত পরিমাণে, তাই এইটুকু ট্যাক্স রাজ্যের জনসাধারণ নিশ্চয় দিতে পারবে। কুটতর্কে না গিয়ে সরকারি তথ্যের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, উন্নয়নের বহর কতখানি! যোজনা কমিশন 'নোটে' বলেছে, পশ্চিমবঙ্গে তফসিলি জাতি, উপজাতি বা আদিবাসী এবং মুসলিমরা হল সবচেয়ে গরিব তিনটি সম্প্রদায়। অথচ এই তিনটি সম্প্রদায়ই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। কমিশনের এই বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যায়, উন্নয়নের মাপকাঠিতে পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকেরও বেশি অংশ পিছিয়ে-পড়া, (সূত্র ঃ বর্তমান-১৪-২-০৯)। বুদ্ধবাবুর সরকার যোজনা কমিশনের এই রিপোর্টকে থোড়াই কেয়ার করে। কারণ তাঁকে খোদ প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ভারতের এক নম্বর মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপা প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয়, পরম বন্ধু কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে ঐ আদিবাসী প্রধান এলাকায় ভাল কাজের জন্য প্রায় ৩ কোটি টাকা 'বোনাস' দিয়েছে (গণশক্তি ১৬-১২-০৮)। অতএব এ রাজ্যে নিশ্চয় উন্নয়ন হয়েছে এবং উন্নততর অর্থসম্পদে ভরা রাজ্যবাসী নিশ্চয় ট্যাক্স দিতে সক্ষম!

যদি রাজ্যবাসী না পারে, তবে সরকার দাওয়াই দিয়েছে, বেশি করে মদ খাও! কারণ যত মদ খাবে, ততই রাজ্যের কোষাগার ফুলেফেঁপে উঠবে। ঠিক ততটাই বেশি পরিমাণে টাটা-সালেম-হিন্দুজাদের 'ডোল' দিয়ে উন্নয়নের রথের চাকা চলবে!

গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে

এস ইউ সি আই ও তৃণমূল প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সিপিএমের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে কেন

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ধাক্কা খাওয়ার আশঙ্কা থেকে সিপিএম এখন চক্রান্তের ভূত দেখছে। ২১ মার্চ সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, নির্বাচনে আমেরিকা তাঁদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের জাল বুনছে। তাঁর কথায়, আট-ন'দিন আগে মধ্য কলকাতার এক হোটেলে মার্কিন কনস্যুলেটের এক অফিসার মুসলিম প্রতিনিধিদের ডেকে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, এর পেছনে চক্রান্তের জালের জরির সুতো জড়িয়ে আছে কিনা বলা কঠিন (আনন্দবাজার ২২-৩-০৯)।

খবরে দেখা যায়, মার্কিন কনস্যুলেটের প্রতিনিধিরা সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ এবং বিভিন্ন দলের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই দেখা করেন এবং নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বিমান বসু নিজেও স্বীকার করেছেন, মার্কিন কনস্যুলেটের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গেও দেখা করেন। এইসব সাক্ষাৎকারগুলিতে কী আলোচনা হয়, কী সিদ্ধান্ত হয়, সে সিদ্ধান্ত দেশের ও জনগণের পক্ষে কল্যাণকর কিনা — এসব বিষয়ে জনগণকে কার্যত অন্ধকারেই রাখা হয়। কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার, কেউই এ বিষয়ে জনগণকে জানানোর কোনও প্রয়োজনই মনে করে না। অথচ এর পরিণামে কোনও ক্ষতি হলে তার মাশুল দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। সেই কারণে এই ধরনের মার্কিনী তৎপরতায় নিরুদ্বেগ থাকার কোনও কারণ নেই।

কিন্তু প্রশ্ন হল, সিপিএমের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্ত করবে কেন? সিপিএম কি সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে? সিপিএম কি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের অভ্যন্তরে কোনও আন্দোলন গড়ে তুলছে? সিপিএম কি দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিকে সংযোজিত-সমন্বিত করে বিশ্বব্যাপী একটা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত করার চেষ্টা করেছে? তারা এসব কিছুই করেনি। তাহলে সিপিএমের বিরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রোশ থাকবে কেন?

বরং সিপিএম তাদের শাসিত তিন রাজ্যে ক্ষমতায় থেকে দেশিবিদেশি একচেটিয়া পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে অনেক কিছুই করেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থে রচিত তথাকথিত বিশ্বায়নের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হবে জেনেও সিপিএম বিশ্বায়নের সুফল নেওয়ার কথা বলে তাকেই অনুসরণ করেছে। ইন্দোনেশিয়ার বহুজাতিক সালিম গোষ্ঠীকে কেমিক্যাল হাব করার জন্য নন্দীগ্রামে কৃষক ও খেতমজুরদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করেছে। 'পুঁজির রঙ নেই' — একথা বলে বহুজাতিক পুঁজিকে এরাজ্যে বিনিয়োগের জন্য আহ্বান করেছে। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের দেওয়া শর্ত মেনে স্পেশাল ইকনমিক জোন গড়ার পথে এগোচ্ছে। খুচরো ব্যবসায় দেশিবিদেশি বৃহৎ পুঁজিকে ঢুকতে দিচ্ছে। তাতে লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এবং হকার উচ্ছেদ হয়ে গেলেও সিপিএমের এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। এহেন সিপিএমের প্রতি পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ রুষ্ট হতে পারে?

সিপিএমের প্রতি সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের নরম মানসিকতা অনেক কারণেই। বামপন্থী আন্দোলনের পীঠস্থান যে পশ্চিমবঙ্গ একদিন 'ম্যাকনামারা গো ব্যাক' স্লোগানে গর্জে উঠেছিল, আজ সেই পশ্চিমবঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিরা সিপিএমের সদর দপ্তরে গিয়ে বিমানবাবুর সঙ্গে মিটিং করে যাচ্ছেন। মার্কিন কর্তারা বিমানবাবুর সঙ্গে কথা বলছেন কি শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য? তাহলে বিমানবাবুরা কার স্বার্থ দেখছেন? মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সিপিএমের প্রতি খুশি রাজ্যের বামপন্থী চেতনা মেরে দিতে তাদের ভূমিকার জন্য। মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ সামরিক মহড়া পুলিশি পাহারায় নির্বিঘ্নে ঘটতে দেওয়ার জন্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সিপিএমের প্রতি খুশি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এটাও নিশ্চয়ই লক্ষ করেছে যে, ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তির বিরোধিতার নামে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার থেকে সিপিএমের সমর্থন প্রত্যাহারের পেছনে আদৌ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ছিল না। বরং তারা এ রাজ্যে পরমাণু-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরিতে উৎসাহী ছিল। সিপিএম যদি যথার্থই এই চুক্তি আটকাতে চাইত, তাহলে এই চুক্তির বিরুদ্ধে বামপন্থী ও দেশপ্রেমিক মানুষকে যুক্ত করে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলত। সে পথে তারা যায় নি। তারা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে। কারণ, কংগ্রেসের অপকর্মের দায় তাদের ওপরও বর্তায়। তাই কেন্দ্রে কংগ্রেসকে সমর্থন করে তাদের শাসিত তিন রাজ্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট চাওয়া অস্বস্তিকর। এই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই তারা সমর্থন প্রত্যাহার করেছে ভোটের দিকে তাকিয়ে। এর মধ্যে আদৌ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতার কোনও বিষয় নেই। তাহলে সিপিএম হঠাৎ তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন ষড়যন্ত্রের ধুয়ো তুলছে কেন?

আসলে সিপিএম বুঝতে পারছে, লোকসভা নির্বাচনে তাদের অবস্থা ভাল নয়। পঞ্চায়েত নির্বাচনে তারা বড় ধাক্কা খেয়েছে, প্রায় অর্ধেক গ্রাম পঞ্চায়েত তাদের হাতছাড়া হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদের আসনেও ক্ষতি হয়েছে অনেক। বিষ্ণুপুর, সুজাপুর ও নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনেও পরাজিত হয়েছে। পরাজয়ের এই ধাক্কা সামলে না উঠতেই এসে পড়েছে লোকসভা নির্বাচন। এই প্রেক্ষাপটে ঝিমানো কর্মীদের চাঙ্গা করার জন্যই সিপিএম মার্কিন চক্রান্তের ধুয়ো তুলছে।

জনগণ প্রতিবাদী হলেই সিপিএম চক্রান্তের গন্ধ পায়। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী মদত — এই মিথ্যা প্রচারও সিপিএম তুলেছিল। সিপিএম সাম্রাজ্যবাদকে একটা শত্রু হিসাবে দাঁড় করাচ্ছে — যদিও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোনও লড়াই তাদের নেই। এই অদ্ভুত অবস্থান বামপন্থী মানুষের কাছে সিপিএমকে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে।

প্যারিস অচল করে দিল ধর্মঘটী শ্রমিকরা

গোটা বিশ্বজুড়ে চূড়ান্ত সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদ ক্রমেই আরও নির্মম অত্যাচার নামিয়ে আনছে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, চলছে ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই, কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে মজুরি। বিশ্বজুড়েই এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়াচ্ছে মেহনতি মানুষ। গত ১৯ মার্চ ফ্রান্সে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সেই ছবিই প্রত্যক্ষ করল গোটা দুনিয়া। সেদিন প্যারিস সহ ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলি অচল করে দিয়েছিল বিশ লক্ষেরও বেশি মানুষের মিছিল। নিম্ন বেতনহার, কাজের নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের বিরুদ্ধে ঐ দিন তারা ধর্মঘট ডেকেছিল। গত ২৯ জানুয়ারির ধর্মঘটের তুলনায় ১৯ মার্চের ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল অনেক বেশি মানুষ। শ্রমিকদের সঙ্গে হাতে প্ল্যাকার্ড -ফেস্টুন নিয়ে অসংখ্য সাধারণ মানুষও সেদিন সপরিবারে পথে নেমেছিল আন্দোলনের সমর্থনে।

ফ্রান্সে বেকারির হার সহন মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। সেদেশে বিশ লক্ষেরও বেশি মানুষ আজ কর্মহীন। এই বছরের মধ্যেই আরও দশ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হবে বলে আশঙ্কা। টোটাল, আর্সেলর-মিত্তল কিংবা মোটর যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা কন্টিনেন্টালের মতো বৃহদায়তন সংস্থাগুলি প্রচুর মুনাফা করা সত্ত্বেও হয় কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে, অথবা ব্যাপকহারে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। ফলে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে শ্রমিকরা; প্রতিবাদে পথে নামছে।

বায়োলজির ছাত্র অরেলিয়ান বললেন, ''আমি ছাত্র। গত কয়েক মাস ধরেই আমি বিক্ষোভ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি। খরচ কমাতে এবং বৃহৎ বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষা করতে সরকার অত্যন্ত বেপরোয়াভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। সামনে অন্ধকারে ঢাকা ভবিষ্যতের চেহারা দেখে আমরা আতঙ্কিত।''

চার সন্তানের পিতা রেল কর্মচারী জিন ক্লড বললেন, ''১৫ বছর ধরে হাড়ভাঙা খাটুনির বিনিময়ে আজ প্রতি মাসে আমি মাত্র ১২০০ ইউরো রোজগার করি। এই টাকায় সংসার চালানো যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, ব্যাপক হারে কর্মচারী ছাঁটাইয়ের জন্য আমাদের খাটুনির বোঝা বেড়েই চলেছে। এ চলতে পারে না।''

ফ্রান্সের বিক্ষোভ মিছিল

ফ্রান্সের শ্রমিক সংগঠনগুলি বর্ধিত ন্যূনতম মজুরি দাবি করেছে এবং শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিরোধিতা করেছে। সেদেশের ৮০ শতাংশ মানুষই এদিনের ধর্মঘটকে সমর্থন করেছেন। সেদিন শুধু যে অধিকাংশ সরকারি অফিস বন্ধ ছিল তাই নয়, স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির দরজাও খোলেনি। ডাক ও তার পরিষেবা এবং রেল ও বিমান পরিষেবা কর্মীর অভাবে ব্যাপক ভাবে ব্যাহত হয়েছিল। অসংখ্য বেসরকারি সংস্থার কর্মীরাও সামিল হয়েছিলেন বিক্ষোভ মিছিলে। (দি হিন্দু, ২০-০৩-০৯)

রক্তধারায় ভেজা কঙ্গোর মাটি

কঙ্গোয় রক্তপাতের ইতিহাস নতুন নয়। অতীতে কঙ্গো যখন বেলজিয়ামের অধীনে ছিল, তখন বিশেষ করে বেলজিয়াম সম্রাট লিওপোল্ডের ২৩ বছরের (১৮৫৮-১৯০৮) শাসনে কঙ্গোর অসংখ্য মানুষ খুন হয়েছে। ইতিহাসবিদদের মতে, বিশ্বের বৃহত্তম গণহত্যাগুলির মধ্যে কঙ্গোর গণহত্যা অন্যতম। ঐ সময়ে নিহত মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ২০ লক্ষ। ১৯০৮-এ কঙ্গোর দখল সম্রাট লিওপোল্ডের হাত থেকে সরাসরি বেলজিয়াম সরকারের হাতে চলে যায়। তারপরেও ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ঔপনিবেশিক লুটপাট চলতেই থাকে।

লিওপোল্ডের শাসনকাল পার হয়ে গেছে ১০০ বছর আগে, কিন্তু কঙ্গোর রক্তস্রোত আজও বন্ধ হয়নি। আফ্রিকা মহাদেশের হৃদ অঞ্চল — কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, রোয়ান্ডা, বুরুন্ডি, উগান্ডা, তানজানিয়া, কেনিয়া — সমগ্র এলাকা জুড়েই গত এক দশক ধরে নৃশংস হানাহানি চলছে। শুধু ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতেই এক হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৮-২০০৩ সালে ৫৪ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিবেশী রোয়ান্ডায় টুটসি গণহত্যায় নিহত হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আর কোনও যুদ্ধে এত মানুষের মৃত্যু ঘটেনি।

পাঁচ বছর ধরে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ের পর ২০০৩ সালে কঙ্গোর হানাহানি বন্ধ হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনীর দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ বাধে কঙ্গোয়। উপনিবেশের যুগে দখলদার শাসকরা যেমন পরাজিত দেশের অধিবাসীদের 'অসভ্য' বলে প্রচার করত, যেভাবে বলত যে তারা নিজেদের দেশে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা চালাতে পারে না, আজকের দিনের প্রচারমাধ্যমগুলি এইসব সংঘর্ষকে জাতিদাঙ্গা হিসাবে প্রচার করে সেই সুরেই কথা বলে। পিছনে থাকা মূল কারণটিকে আড়াল করে কোনওভাবেই এ হানাহানি বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে প্রবল হতাশার ভাব দেখায়। আসলে সেই লিওপোল্ডের আমলের মতো আজকের দিনের গণহত্যার পিছনেও রয়েছে একটাই কারণ — ধনী দেশগুলির দ্বারা আফ্রিকার অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করা।

ঔপনিবেশিক যুগের প্রথম দিকে আফ্রিকার এই অঞ্চল থেকে ইউরোপে চালান হত হাতির দাঁত, কাঠ ও রাবার। পরে সেই তালিকায় যুক্ত হয় তামা, টিন, দস্তা, হিরে, সোনা, ইউরেনিয়াম ও কোবাল্ট। ইদানীং এখান থেকে আর এক দুর্মূল্য সম্পদ 'কোল্টান' চলে যাচ্ছে অন্য দেশে। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের লালসায় শিল্পোন্নত ধনী দেশগুলি ও বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থাই যে এই গণহত্যাগুলির পিছনে রয়েছে, আজ আর তা গোপন নেই। এমনকী রাষ্ট্রসংঘ ও কয়েকটি আন্তর্জাতিক অসরকারি প্রতিষ্ঠান এই দুষ্টচক্রে যুক্ত কোম্পানি ও দেশগুলির তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে শুধু নয়, রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কঙ্গোর খনিজ সম্পদ লুটপাটের বেআইনি ব্যবসা বন্ধের জন্য রোয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও উগান্ডার বিরুদ্ধে অন্তত তিনবার প্রস্তাব এনেছে।

কী ঘটছে সেখানে? কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র নামক দেশটির সীমানার মধ্যে থাকা উৎকৃষ্ট খনিজ সম্পদগুলি সাম্রাজ্যবাদের মদতে লুটে নিচ্ছে রোয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও উগান্ডার সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী সশস্ত্রবাহিনী। বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এই কাজে মাফিয়াদেরও ব্যবহার করছে। ২০০২ সালের রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে এই বেআইনি কাজে লিপ্ত কোম্পানিগুলির তালিকায় বিখ্যাত'সিটিব্যাংক'-এর নাম আছে। এছাড়াও আছে কিছু বিদেশি দূতাবাসের কর্মচারীদের নাম। দেখা যাচ্ছে, তালিকার বেশিরভাগ কোম্পানিই ইউরোপের, সঙ্গে রয়েছে আফ্রিকা ও এশিয়ারও কিছু কোম্পানি। ভারতও পিছিয়ে নেই। এদের মধ্যে দুটি হল ভারতীয় সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘের এই রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেন, জার্মানি, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং আমেরিকা কঙ্গোর সম্পদ অবাধে লুটে নিতে সেদেশের বিভিন্ন স্বৈরাচারী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলিকে সরাসরি মদত দিয়ে হানাহানি বাধাচ্ছে ও সেগুলিকে বাড়তে সাহায্য করছে। পশ্চিমের এই শক্তিধর দেশগুলি নিজেদের পরিকল্পনা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের ধারের টাকায় এই অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে।

কোল্টান ধাতুটিকে কেন্দ্র করে ইদানীং এই দুষ্টচক্র কাজ করছে। এই ধাতুটি সেলফোন সহ ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র তৈরির জন্য অতি প্রয়োজনীয়। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতেই পাওয়া যায় বিশ্বের ৮০ শতাংশ কোল্টান। অন্যদিকে রোয়ান্ডায় এক বিন্দুও কোল্টান পাওয়া যায় না। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল, গোটা বিশ্বে কোল্টান রপ্তানি হয় রোয়ান্ডা থেকেই। রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্ট বলছে, বেআইনি ভাবে কঙ্গোর খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও রপ্তানির এই কাজটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে একদল সশস্ত্রবাহিনী। এই বাহিনীকে অস্ত্র ও অর্থ জোগায় রোয়ান্ডা সরকারের বকলমে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এবং পশ্চিমী শক্তিধর দেশগুলি।

আফ্রিকার এই নির্মম হানাহানি ও রক্তপাত বন্ধ করার ব্যাপারে বিশ্বের কোথাওই কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। ভারত সরকারও এ ব্যাপারে আফ্রিকায় মার্কিন ও ইউরোপীয় নয়া-উপনিবেশবাদকে দায়ী করে নিজের দায়িত্ব সারছে। অথচ এভাবে ভারত সরকার পার পেতে পারে না। কারণ, ইতিমধ্যেই সে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য মধ্য আফ্রিকার দেশগুলির সরকারগুলির সাথে কথাবার্তা চালাতে শুরু করেছে। এ বছরের জানুয়ারি মাসে শিল্পপতিদের সংগঠন ফিকি যে 'ইন্ডিয়া-আফ্রিকা পার্টনারশিপ সামিট'-এর আয়োজন করেছিল, তাতে প্রধান অতিথি ছিলেন রোয়ান্ডার প্রেসিডেন্ট পল কাগামে। ভারত সরকার যত তথাকথিত নির্জোট আন্দোলন থেকে সরে এসে মার্কিনঘেঁষা নীতি নিয়ে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ পূরণের চেষ্টা করছে, ততই পশ্চাদপদ বন্ধু দেশের জনগণের সামনে ভারতীয় লুঠেরাদের দাঁত নখ বেরিয়ে পড়ছে। ভারত সরকারের তথাকথিত শান্তিকামী বুলির আসল চরিত্র বেরিয়ে আসছে।

কোচবিহারে পরিচারিকা সমিতির ডেপুটেশন

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি এবং পরিচয়পত্র প্রদান, বিপিএল তালিকায় নাম নথিভুক্তকরণ এবং সন্তানদের শিক্ষা ও তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করার দাবিতে ২৭ মার্চ কোচবিহার জেলা পরিচারিকা সমিতির উদ্যোগে পরিচারিকারা জেলা সহকারি লেবার কমিশনারকে স্মারকলিপি দেন। মিনতি দাস, বাসন্তী বর্মন, কুঞ্জ দাস প্রমুখ পরিচারিকা তাঁদের জীবনের ব্যথা-বেদনার কথা তুলে ধরেন। সংগঠনের পক্ষে কমরেড ফিরোজা আহমেদ ক্ষোভের সাথে বলেন, সিপিএম সরকার পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতিটুকু দিতেই অস্বীকার করছে। তিনি এর বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্রতর করার আহ্বান জানান।

হাওড়ায় দূষণবিরোধী কনভেনশন

ঘোড়াঘাটা পেপার মিলের মারাত্মক দূষণ প্রতিরোধে 'কৃষ্ণা টিসু দূষণ প্রতিরোধ কমিটি'র আহ্বানে ঘোড়াঘাটা বাজারে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন 'ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি'র বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী সফিউল আলম, খাদ্যবিজ্ঞানী দেবব্রত বেরা ও 'ভাটনগর' পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী সৌমিত্র ব্যানার্জী। ইতিপূর্বে এই বিজ্ঞানীরা এই এলাকার মাটি ও কারখানা থেকে নির্গত জল সংগ্রহ করে পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। উক্ত কনভেনশনে পরীক্ষার প্রাপ্ত ফলাফল ও তার ক্ষতিকারক দিক তিন বিজ্ঞানী খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরেন। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন শিক্ষক অজিত ভট্টাচার্য। বিভিন্ন পর্যায়ে দূষণবিরোধী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরে মূল বক্তব্য রাখেন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক আশুতোষ সামন্ত। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমিটির সহসভাপতি প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীকান্ত জানা এবং যুগ্ম সম্পাদক আবুল হাসেম খলিফা ও নিখিলরঞ্জন বেরা। এই কনভেনশন এলাকার মানুষের মধ্যে গভীর ছাপ ফেলেছে ও তাঁদের উজ্জীবিত করেছে।

জবলপুরে নারীদিবসে আলোচনাসভা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবসের শতবর্ষে জবলপুরে এম এস এসের এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচ্য বিষয় ছিল ঃ আন্তর্জাতিক নারীদিবসের শতবর্ষে সমাজে মহিলাদের অবস্থা। আলোচনা করেন সংগঠনের সম্পাদিকা কমরেড গোপা ভট্টাচার্য, সহ সম্পাদিকা কমরেড সুভদ্রা বিশ্বাস প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন এম এস এসের জেলা সভানেত্রী কমরেড চন্দ্রা পাত্র।

কর্মসংস্থানের নামে প্রতারণা

তিনের পাতার পর

বেকারদের জীবনে 'কর্মসংস্থান' বা সচ্ছলতার উদয় ঘটাতে যে পারবে না, সেগুলিও যে আগেকার প্রকল্পগুলির মতোই অস্তমিত হবে — সরকার নিজে সেটা খুব ভাল করেই জানে।

একদিকে জনগণকে প্রতারণা এবং অন্যদিকে দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের পাঁকে নিজেদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলা — এ বৈশিষ্ট্য মালিক পুঁজিপতিশ্রেণীর সকল সেবাদাসদেরই, সে তারা যে নামেরই হোক বা যে ঝান্ডার অধিকারীই হোক। কিন্তু তফাৎ এই যে, কংগ্রেস-বিজেপি'র মতো দলগুলি এইসব অপকর্ম করে দক্ষিণপন্থার ঝান্ডা উড়িয়ে, আর সিপিএমের মতো দলগুলি করে লালঝান্ডা হাতে নিয়ে 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ' স্লোগান দিতে দিতে।

ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা

ভোটের বাঁশি বাজতেই জনদরদ উথলে পড়ছে সি পি এম, কংগ্রেস বা বিজেপির। কংগ্রেস বা বিজেপি কেন্দ্রের ক্ষমতায় ছিল, সি পি এম ঠেকা দিয়ে ইউ পি এ-কে গদিতে টিকিয়ে রেখেছিল। সি পি এম লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের ইস্তাহার বার করেছে। সি পি এমের পলিসি হল, গাছেরও খাব, তলারও কুড়োব। নির্বাচনী ইস্তাহারে তারা দেশের মানুষের সর্বনাশ ঘটানোর জন্য কংগ্রেসকে দুষছে; কিন্তু যে কথাটা তারা গোপন রাখছে, তা হল, এইসব সর্বনাশা সিদ্ধান্তগুলি সংসদে পাশ করার সময়ে তারা সরকারের সমর্থক হিসাবেই থেকেছে। কেন্দ্র বিশ্বায়ন-বেসরকারীকরণের নীতি ঘোষণা করেছে, আর সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে 'বিকল্প' অর্থনীতির বাকচাতুর্যের আড়ালে সেই নীতি কার্যকর করে, বিশেষ করে শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যকে রসাতলে পাঠিয়েছে।

নির্বাচনের মুখে জনগণের সমালোচনার সামনে সি পি এম সবচেয়ে গাড্ডায় পড়েছে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের ব্যাপারে। তাদের শিল্পায়ন ও কৃষির অগ্রগতির ভাঁওতাও ধরা পড়ে গিয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান বত্রিশতম। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নিচে। নির্বাচনী কর্মসূচিতে তাই নিজেদের কাজের ফিরিস্তি দেওয়ার থেকেও বেশি তারা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগার রাস্তা নিয়েছে। চার বছর ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন করে সমস্ত সুযোগসুবিধা আদায়ের পর শেষমুহূর্তে সমর্থন প্রত্যাহার করার পিছনে তাদের এই চালাকি কাজ করেছিল — অর্থাৎ, সরকারের অপকর্মের জবাবদিহি করার সময় এলে তারা কেন্দ্রকে দোষ দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করবে।

তারা বলছে, কেন্দ্র মোট জিডিপির ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে খরচ না করে মাত্র তিন শতাংশ খরচ করছে। যেটা তারা বলছে না, তা হল, কেন্দ্র যে টাকাটা রাজ্যকে দিচ্ছে, সেটা কম হলেও তার পুরোটা খরচ করার মতো তাদের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাই নেই। একই অবস্থা জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও। সেখানে কেন্দ্র জিডিপির এক শতাংশও খরচ করে না বললেও রাজ্য কী করে, সেটা সম্বন্ধে তারা নীরব। কেন্দ্র সরকারি হাসপাতালে বেসরকারীকরণের নীতি ঘোষণা করছে, আর রাজ্যে সি পি এম সরকারি হাসপাতালের জমি, ঘরবাড়ি, নানা বিভাগ, পথ্য সরবরাহ বেসরকারি হাতে তুলে দিচ্ছে। সি পি এমের সুশাসনে রাজ্যের হাসপাতালগুলি নরকে পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সাধারণ ও অতি প্রয়োজনীয় ওষুধও পাওয়া যায় না। সবই কিনে দিতে হয়। ফলে শহরের বড় বড় প্রাইভেট হাসপাতাল বা নার্সিংহোম শুধু নয়, সরকারি হাসপাতালের খরচও সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। শিক্ষার যা অবস্থা, তাতে ছাত্রের পিছনে কোচিং বা প্রাইভেট টিউটর দিতেই হবে। মানুষের অবস্থা একেই শোচনীয়, তার ওপর যদি পরিবারের একজন কোনও কারণে অসুস্থ হয়, তাহলে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। ছুটতে হয় শাসকদলের নেতা বা মন্ত্রীদের ধরে সরকারি হাসপাতালে ফ্রি করা যায় কী করে, তার ফিকির খুঁজতে।

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সি পি এম বলেছে, দেশে 'কৃষিসংকট অব্যাহত', কৃষকের আত্মহত্যা কমেনি, বরং বেড়েছে। কেন তা হয়েছে? কেন চাষি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে? কেন লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে চাষের খরচ? কেন চাষের উপর মাল্টিন্যাশানাল কর্পোরেশনগুলির বজ্রমুষ্টি জেঁকে বসছে? এসব প্রশ্নের উত্তর তো নেইই, এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও চাষি কেন ফসলের দাম পাচ্ছে না, কেন বাজারে আলুর দাম এগারো টাকা কিলো, অথচ চাষি দুটাকা কিলো দামও পায়নি, তার জবাব দেওয়ার দায় তারা এড়িয়ে গিয়েছে। কেন পশ্চিমবঙ্গে সার নিয়ে অবাধে কালোবাজারি চলছে? কেন এরাজ্যে কৃষিবিদ্যুতের অত্যধিক দাম, তার জবাবও তারা দেয়নি। ঋণের দায়ে চাষির আত্মহত্যা পশ্চিমবঙ্গে অজানা ছিল। সি পি এমের ত্রিশ বছরের শাসনে তা শুরু হয়েছে এবং মাত্র কয়েক বছরে অন্তত ২৫ জন চাষি আত্মহত্যা করেছে। কাজেই চাষি আত্মহত্যা করছে বলে দিল্লির ওপর দায় চাপিয়ে সি পি এম রেহাই পেতে পারে না।

গরিবের দুঃখে মায়াকান্নায় কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে সিপিএম। গরিবের দুঃখে কাতর হয়ে সস্তায় চাল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে কংগ্রেস, বিজেপি ও সি পি এম। রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত বলেছেন, গরিবদের জন্য ২ টাকা কিলো দরে চাল দেবেন। দেওয়ার যদি ক্ষমতাই থাকে এবং গরিবের জন্য সত্যিই দুঃখ থাকে, তবে আগে দিলেন না কেন? সকলেরই মনে আছে, '৭৭ সালে নির্বাচনে ডঃ অশোক মিত্র পোস্টার দিয়েছিলেন, 'যদি একটাকা কিলো চাল চান, তবে ডঃ অশোক মিত্রকে ভোট দিন'। বলাবাহুল্য ভোটের পর অশোক মিত্র অর্থমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু ভোট ফুরোতেই তাঁর প্রতিশ্রুতি উবে গিয়েছে। কেন্দ্রে বসে কংগ্রেস বলছে, তিন টাকা কিলো চাল দেবে। চালবাজিতে টেক্কা দিয়েছেন আদবানিজি। তিনি বলেছেন, দেবো কি, বিজেপি শাসিত রাজ্য ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে ইতিমধ্যেই আমরা দু' টাকা কিলো দরে চাল দিচ্ছি।

দেখা যাচ্ছে, সকলেই বলছে, চাল দেবে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা জনগণকে। সরকারি হিসাবে বি পি এল-এর সংখ্যাটা ২৬ শতাংশের নিচে নেমে গিয়েছে। তার মানে কি দেশে দারিদ্র কমে গিয়েছে? মোটেই না। এদেশে যে বিরাট সংখ্যক পড়ুয়া অর্ধপথেই স্কুল ছেড়ে দেয়, তার প্রধান কারণ হল দারিদ্র। আজও বহু ছাত্র না খেয়ে স্কুলে আসে। তা সত্ত্বেও সরকারি হিসাবে দারিদ্র কমে যাচ্ছে কী করে! কারণ দারিদ্র মাপবার মাপকাঠিটাকেই ছোট করে আনা হচ্ছে। আগে দারিদ্র মাপা হত খাদ্য ও পুষ্টির নিরিখে। তারপর মাপা হতো মাসে একজন কত টাকা খরচ করতে পারে তার নিরিখে। এখন মাপা হয় আরও জটিল এক প্রক্রিয়ায়, যাতে ঘরে একটা সাইকেল থাকলে বা একটা বাচ্চা স্কুলে গেলে সেই পরিবার দারিদ্রসীমার উপরে উঠে যায়। তার ওপর কংগ্রেস, বিজেপি ও সি পি এম যে যেখানে ক্ষমতায় থেকেছে, প্ল্যান করে রেশন ব্যবস্থাটাই তুলে দিয়েছে। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার বলছে, কেন্দ্র রেশন তুলে দিচ্ছে, আর কেন্দ্র বলছে, রাজ্য তার কোটার চাল, গম তুলছে না। আসলে সকলেই বিশ্বায়নের সুরে সুর মিলিয়ে কোরাসে প্রাইভেটাইজেশনের রামধুন গাইছে। কাজেই ভোটের মুখে চালবাজি ভোট পার হতেই শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

সি পি এমের অন্য প্রতিশ্রুতির মধ্যে আছে, ভূমিসংস্কার, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা। পশ্চিমবঙ্গে তাদের কার্যকলাপই দেখিয়ে দিচ্ছে, তাদের প্রতিশ্রুতির ভবিষ্যৎ। '৭৭ সাল থেকে একটানা রাজ্যে বাজানো হয়েছে ভূমিসংস্কার ও অপারেশন বর্গার ঢাক। তার সাথে পাল্লা দিয়ে বছর বছর লক্ষাধিক হারে বেড়েছে ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা। এখন সি পি এম বলছে, ভূমিসংস্কারের প্রথম পর্যায় শেষ, প্রথম পর্যায়ের ভূমিসংস্কারের ফলে গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। এবার দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে। গ্রামের মানুষ ছুটছে ১০০ দিনের কাজ ধরতে। পাচ্ছে গড়ে বছরে ১৮ দিনের মতো। আর সি পি এম বলছে, গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমি সংস্কার দেখে সাধারণ মানুষের চক্ষুস্থির, এই যদি সংস্কার হয়, তবে সংহার কাকে বলে? তাদের দ্বিতীয় দফার ভূমিসংস্কারের মন্ত্র হল — গ্রাম-শহরে জমির সিলিং তুলে দাও, চাষিকে পথে বসিয়ে শিল্পায়নের নামে উর্বর কৃষিজমি তুলে দাও একচেটিয়া শিল্পপতিদের হাতে। গরিব চাষির রক্ত জল করে তৈরি ফসল, বীজ, সার নিয়ে চলুক ফড়ে আর ফাটকাবাজদের রাজত্ব। কৃষিবিদ্যুতের চড়া দর চাষির পকেট কেটে আদায় করো। বাজারে কৃষিপণ্যের দাম বাড়ুক অবাধে, ফাটকাবাজদের পকেট ভরুক, চাষি মরুক ফসলের দাম না পেয়ে। সি পি এম ফ্রন্ট সরকার সোচ্চারে গোয়েবলসীয় প্রচার চালাক — আমরা আলু উৎপাদনে প্রথম, চালে দ্বিতীয়, মাছে ফার্স্ট, পিছিয়ে নেই কোথাও। এমনকী অনাহারেও না। সি পি এমের শিল্পায়নের চরিত্র এতদিনে লোকে ধরে ফেলেছে। রাজ্যে লক্ষাধিক ছোটবড় কারখানা বন্ধ। '৯৪ সালের সমীক্ষায় প্রকাশ হয়েছিল, রাজ্যে ৫৬ হাজার কলকারখানা বন্ধ। তারপর উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা হয়নি। কিন্তু সাধারণ মানুষ দেখছে, রাজ্যে বেকার বাড়ছে লক্ষ লক্ষ। দুর্গাপুর, কল্যাণী, উত্তর চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চল শ্মশান হয়ে গিয়েছে। কলকাতা শহরতলি, হাওড়া, গঙ্গার দু'ধারে বন্ধ কারখানার শত শত একর জমি পড়ে আছে। কঙ্কালসার শেডগুলির তলায় সমাজবিরোধীদের অবাধ রাজত্ব। সম্প্রতিকালে হলদিয়া পেট্রোকেমিকেলস, বক্রেশ্বর, মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি যে দু'চারটে অত্যাধুনিক শিল্প হয়েছে, ,তাতে জমি থেকে যত মানুষ উচ্ছেদ হয়েছেন, কর্মসংস্থান হয়েছে তার চেয়ে কম। এখন সি পি এমের যুবফ্রন্ট ডি ওয়াই এফ টাটার ন্যানো গাড়ির ছবি দিয়ে যে হোর্ডিং

সাতের পাতায় দেখুন

ক্ষমা চাওয়ার ভেক ধরেছে সিপিএম

একের পাতার পর

কাছে ক্ষমা চাইতে হয়! তা তাঁরা চাইছেন না কেন? পলিটব্যুরোর যে নেতারা গরিব কৃষকদের লাইফ হেল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন, বা কার কত ক্ষমতা দেখে নেওয়ার কথা বলেছিলেন, তাঁরাই বা ক্ষমা চাইবেন না কেন? আসলে ক্ষমা তো তাঁরা সত্যিই চাইছেন না। ভোট-রাজনীতির একটি কৌশল হিসাবেই একে ব্যবহার করতে চাইছেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মী অনীতা দেওয়ানকে বানতলায় সিপিএম বাহিনী প্রকাশ্যে অত্যাচার করে খুন করেছিল। সিঙ্গুরে কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের কর্মী তাপসী মালিকের উপর চরম অত্যাচার চালিয়ে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে সিপিএম কর্মীরা। এসবের জন্য আজ কার কাছে ক্ষমা চাইবেন সিপিএমের নেতা-কর্মীরা? নন্দীগ্রামের সন্তানহারা, ধর্ষিতা মায়েরা পারবেন কি সিপিএম নেতা-কর্মীদের ক্ষমা করতে? তিন দশকে বিরোধী দলগুলির উপর হিংসার যে রাজনীতি তাঁরা রাজ্যে কায়েম করেছেন তাও নজিরবিহীন। শুধু মাত্র বিরোধী রাজনীতি করার অপরাধে এস ইউ সি আই-এরই ১৫১ জন নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে ৪৯ জন নেতা-কর্মীকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হয়েছে। কয়েক হাজার কর্মীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা চলছে। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য, কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের সম্পাদক ষাটোর্ধ্ব কমরেড আমির আলি হালদারকে দিনের বেলায় তাঁর বাড়ির সামনে যেভাবে সিপিএম দুষ্কৃতীবাহিনী বোমা মেরে, কুপিয়ে খুন করেছিল, তা কি তাদের রাজনৈতিক হিংস্রতারই পরিচয় নয়? এমন সহস্র উদাহরণ গোটা রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রশাসনিক সহায়তায় সংগঠিত তাঁদের এই দুষ্ট রাজনীতির সামনে অসংগঠিত মানুষের অসহায়তাকেই তাঁরা তাঁদের প্রতি সমর্থন বলে গোটা দেশের কাছে প্রচার করেছেন।

সব কিছুরই যেমন একটা সীমা থাকে, তেমনই মানুষের মেনে নেওয়ার, সহ্য করারও একটা সীমা আছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে টাটা-সালিমদের জন্য জমি দখল করতে তাঁরা যে নৃশংসতা নামিয়ে এনেছিলেন, তা মানুষের এই সহ্যের সীমাকে অতিক্রম করেছিল। ফলে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মানুষ। রাষ্ট্রীয় এবং দলীয় সন্ত্রাসকে প্রতিহত করে জয়ী হয়েছে তাঁরা। এই আন্দোলন শুধু সেখানকার মানুষ নয়, গোটা রাজ্যের মানুষকে জাগিয়ে দিয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএমের অপশাসনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন রাজ্যের বিরাট সংখ্যক মানুষ। আর তাতেই এই ভণ্ড মার্কসবাদীদের 'বীরত্বের' মুখোশটা খুলে পড়েছে। লোকসভা নির্বাচনে আরও বড় বিপর্যয়ের আশঙ্কায় মানুষের কাছে ক্ষমা চাইতে আসছেন। এই ক্ষমা চাওয়ার মধ্যে কোথাও রাজনৈতিক সততা নেই। বরং তাদের নীতিহীনতাকেই তা আরও প্রকট করে দিয়েছে। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে যাদের মনোভাব বাস্তবে এতটুকুও বদলায়নি, কতখানি নীতিহীন হলে তারা এমন অনায়াসে ক্ষমা চাওয়ার কথা বলতে পারে! আসলে ভোটের জন্য তারা যেমন ভয় দেখাতে পারে, বুথ দখল করতে পারে, মারধর করতে পারে, খুন করতে পারে, তেমনই তার জন্য ক্ষমা চাওয়ার ভান করতেও তাদের লজ্জা হয় না। এ তাদের একই নীতিহীন রাজনীতির দু'টি রূপ।

তাঁদের রাজনৈতিক আচরণবিধির মধ্যে কোথাও বিনয়, ক্ষমা প্রভৃতি সদগুণগুলির স্থান নেই — নেই উন্নত চরিত্র অর্জনের সংগ্রাম। অথচ বামপন্থী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাণই হল উন্নত রুচি-সংস্কৃতির মান। না হলে, বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গে তার কোনও পার্থক্যই থাকে না। বাস্তবে সিপিএমের রাজনীতির সঙ্গে আজ চরম অবক্ষয়িত বুর্জোয়া রাজনীতির কোনও পার্থক্যই নেই। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এমনিতেই তাঁরা কোনদিনই যুক্তিকে প্রাধান্য দেননি, পেশিশক্তিকেই চূড়ান্ত বলে মনে করেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তো তাঁদের এই চরিত্র আরও প্রকট হয়েছে। সরকারি ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে তাঁরা মানুষকে মানুষ বলেই গণ্য করেননি। সাধারণ মানুষের উপর যে যত দাপট দেখাতে পেরেছে, দলে তার স্থান হয়েছে তত উপরে। পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার, দাপটের এই রাজনীতির চর্চাই সিপিএম করে এসেছে গত তিন দশক ধরে। যে কোনওরকম বিরোধিতাকেই অবর্ণনীয় অত্যাচারে স্তব্ধ করতে চেয়েছে— বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, খেতের ফসল, পুকুরের মাছ নষ্ট করেছে, মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে, ধর্ষণ করেছে, নির্বিচারে খুন করেছে। সেখানে কোথাও ন্যূনতম বিনয়, ক্ষমার চিহ্ন সিপিএম কর্মী-দুষ্কৃতীবাহিনীর মধ্যে দেখা যায়নি।

ক্ষমা অতি মহৎ গুণ। কিন্তু ক্ষমা যেখানে অত্যাচারীকে আরও শক্তিশালী হয়ে অত্যাচারের মাত্রাকেই বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে, সেখানে তা ক্ষতিকর, দুর্বলতা। সিপিএম নেতাদের কোনও স্তোকবাক্যে, কোনও ছল, কোনও চাতুরিতেই রাজ্যের মানুষের এই দুর্বলতা দেখানো উচিত নয়। দেখালে তা হবে আত্মঘাতী। চরম জনস্বার্থবিরোধী, দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী এই বিষ-রাজনীতিকে আজ সমস্ত দিক থেকেই পরাজিত করতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে, শক্তিশালী করতে হবে জনস্বার্থ রক্ষার রাজনীতিকে, গণআন্দোলনের শক্তিকে।

মানি পাওয়ারই আজ চালাচ্ছে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র

প্রতিটি নির্বাচনে বড় বড় রাজনৈতিক দল কোটি কোটি টাকা খরচ করে। নানা রংয়ের দেওয়াল লিখন, নানা মাপের পোস্টার, বড় বড় হোর্ডিং, প্রার্থীর সচিত্র কাটআউট, বড় বড় জনসভা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার, হাতে হাতে বা গোপনে অর্থ দান, বিনা পয়সায় অঢেল মদ বিতরণ, খানাপিনা ইত্যাদি দেখা-অদেখা নানা ক্ষেত্রে যে কোটি কোটি টাকা তথাকথিত বড় বড় দলগুলি খরচ করে, কোথায় পায় এই টাকা? কারা দেয়? কেন দেয়? অধিকাংশ মানুষ নির্বাচনের সময় এই প্রশ্নগুলি নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ একটি দলের কার্যকলাপ এই বিষয়টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নির্বাচনের জন্য টাকা সংগ্রহ নিয়ে সম্প্রতি আসামের রাজনীতিতে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ কলকাতায় গিয়ে চা-বাগান মালিকদের কাছ থেকে ২১ কোটি টাকা নিয়েছেন। কলকাতায় অসম হাউসের সরকারি আবাসে ডিব্রুগড়ের এক বৃহৎ চা ব্যবসায়ীর উদ্যোগে বেশ কিছু চা সংস্থার মালিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে এই টাকা দিয়েছেন বলে অভিযোগ। প্রথম দিকে কংগ্রেস টাকা নেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছিল। কংগ্রেস নেতা অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা চা-লবির কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগকে কটাক্ষ করে বলেছিলেন, ‘‘চা-বাগান মালিকদের নিজেদেরই দুঃস্থ অবস্থা। পারলে ওরাই টাকা নেয়। সাহায্য দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না’’ (আনন্দবাজার ২১-৩-০৯)। কংগ্রেস নেতার এই হাস্যকর মন্তব্য আসাম রাজনীতিতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কংগ্রেস চা-মালিকদের কাছে শ্রমিকস্বার্থ বিকিয়ে দিয়েছে কোটি কোটি টাকায়, এই কথাও উঠতে থাকে। এই অবস্থায় চাপে পড়ে তরুণ গগৈ বলেছেন, ‘‘হ্যাঁ আমি টাকা নিয়েছি। এতে অন্যায় কোথায়’’? গোটা কংগ্রেস পার্টি টাকা নেওয়াকে সমর্থন জানিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস বলেছে, আমেরিকায় ব্যবসায়ীরা খোলাখুলি চেকে পছন্দের দলকে টাকা দেয়। অসমে গগৈ সেই প্রথাই শুরু করেছেন।

শুধু চা মালিকরাই নয়, কংগ্রেসকে বিভিন্ন পুঁজিপতিগোষ্ঠী টাকা দিচ্ছে। মুম্বই থেকে প্রকাশিত এক পত্রিকা সম্প্রতি দেখিয়েছে, ২০০৩-২০০৭ সালের মধ্যে কংগ্রেস, বিজেপি এই দুটি দল কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে ৫২ কোটি টাকার বেশি নিয়েছে। ‘তথ্য জানার অধিকার’ প্রয়োগ করে প্রাপ্ত এই হিসাব যে নেওয়া টাকার সামান্য একটা ভগ্নাংশ, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাস্তবে তারা নিয়েছেও অনেকগুণ বেশি, যা সংশ্লিষ্ট দলগুলি স্বীকার করবে না। রাখঢাক করে দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, কংগ্রেসকে সবচেয়ে বেশি টাকা দিয়েছে আদিত্য বিড়লা গ্রুপ। — ২১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। কংগ্রেসকে টাটারা দিয়েছে ৪.৩২ কোটি, ভিডিওকন দিয়েছে ৪.৫০ কোটি, লারসেন টুবরো দিয়েছে ১ কোটি, বাজাজ দিয়েছে ১ কোটি টাকা।

পুঁজিপতিরা বিজেপিকেও কোটি কোটি টাকা দিয়েছে। বিড়লা গোষ্ঠী দিয়েছে ২.৯৬ কোটি, ভিডিওকন দিয়েছে ৩.৫০ কোটি, স্টার লাইট দিয়েছে ১০ কোটি, লারসেন টুবরো দিয়েছে ১ কোটি, বাজাজ দিয়েছে ১ কোটি। একই পুঁজিপতিগোষ্ঠী কংগ্রেসকে যেমন টাকা দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে বিজেপিকেও।

পুঁজিপতিশ্রেণীর টাকা নেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএমও পিছিয়ে নেই। তবে সিপিএম এমন সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে এসব লেনদেন করে যে, প্রায়ই তা খবরের কাগজে আসে না। তা সত্ত্বেও গোপনীয়তার প্রাচীর ভেদ করে যতটুকু খবর বাইরে আসছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, সিপিএমের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য কমিটিকে জুয়াচোর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা সত্যম কম্পিউটার্স ৫ লক্ষ টাকা দিয়েছে। নন্দীগ্রামে কেমিকেল হাব গড়ে দেওয়ার জন্য সালেম গোষ্ঠীর কাছ থেকে এবং সিঙ্গুরে ন্যানো কারাখানার নামে টাটার কাছ থেকে যে সিপিএম বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশই থাকতে পারে না। সিপিএম সরকার গোয়েঙ্কা কোম্পানিকে বারবার ইচ্ছামতো বিদ্যুতের দাম বাড়াতে দিয়েছে। ফলে তারাও যে বিনিময়ে উপযুক্ত প্রাপ্য সিপিএমকে দেয়নি বা সিপিএম নেয়নি — তা কি আদৌ বিশ্বাস্য? রাজ্যের বাসমালিকরাও সিপিএমকে কম দেয়নি। সিপিএমের ব্রিগেড সমাবেশ ভরাতে বাসমালিকরা তাদের বাসগুলি যে দিয়ে থাকে, একথা রাজ্যবাসীর অজানা নয়। অনেকেই জানেন, মেদিনীপুর শহরে পার্টি অফিস তৈরি করার জন্য সিপিএম ১ কোটি ২০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা দিয়ে একটি জমি কিনেছে। সংবাদে প্রকাশ, এই পার্টি অফিস বানাতে বাজেট ধরা হয়েছে ২ কোটি টাকা। এই টাকা কোত্থেকে আসছে — সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে সিপিএমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক দীপক সরকার সদম্ভে জবাব দেন, ‘‘আমরা ১ কোটি নয়, ৫০০ কোটি টাকাতেও জমি কিনতে পারি, তাতে আপনাদের কী’’ (বর্তমান, ৪-৪-০৯)? সিপিএমের যখন টাকা আছে, তারা এরকম বাড়ি করতেই পারে, কিন্তু প্রশ্ন হল, এই টাকা আসছে কোথা থেকে? রাজ্যবাসীর এ বিষয়ে প্রশ্ন করার অধিকার অবশ্যই আছে। সিপিএম লোকদেখানো যে চাঁদা তোলে, তাতে যে এই রাজকীয় বন্দোবস্ত চলে না, তা সকলেই বোঝে। সালেম, টাটা, গোয়েঙ্কা, জিন্দাল প্রভৃতি যে পুঁজিপতিগোষ্ঠী সিপিএমকে ঘিরে রেখেছে, তারা ঠিক কী পরিমাণ টাকা সিপিএমকে দিয়ে থাকে, তা অবশ্যই তদন্তের বিষয়। সিপিএমের টাকার প্রধান উৎস এরাই। তাছাড়া সিপিএমের আয়ের একটা বড় অংশ আসে তোলাবাজি থেকে। জনগণের কাছ থেকে মাঝে মধ্যে যে চাঁদা তারা তোলে, তা বাস্তবে তাদের এহেন কাজগুলিকে আড়াল করার ঢাল মাত্র।

প্রশ্ন হল, পুঁজিপতিরা এইসব রাজনৈতিক দলগুলিকে কোটি কোটি টাকা কেন দেয়? যে পুঁজিপতিরা সবকিছু মুনাফার নিরিখে বিচার করে, তারা কোটি কোটি টাকা রাজনৈতিক দলকে দেয় কি এমনি এমনি? রাজনৈতিক দলগুলিই বা কেন এদের কাছ থেকে টাকা নেয়? তারা টাকার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণের স্বেচ্ছাদানের উপর নির্ভর করতে পারে না কেন? কংগ্রেস স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েও জাতীয় পুঁজিপতিদের থেকে টাকা নিয়ে আন্দোলনের তহবিল গড়ত। সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও তারা আন্দোলনের তহবিল সংগ্রহ করত। সেইসময় স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেও প্রশ্ন উঠেছিল, বুর্জোয়াদের কাছ থেকে এভাবে টাকা নেওয়া সমীচীন কিনা। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী মতাবলম্বী ছিলেন, এ প্রশ্ন তাঁদের ভাবিয়েছিল। পুঁজিপতিশ্রেণীর টাকা নিলে পার্টিতে তাদেরই নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়, পার্টিকে তারাই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার সুযোগ পায়। যে দল সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করার কথা ভাববে — এই পরিস্থিতি তার সামনে বাধা হিসাবে কাজ করতে বাধ্য। যেমন, কংগ্রেস যে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে যুক্ত হল না, সিঙ্গুরে টাটার জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দাঁড়াল না, মালিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ নিয়ে কংগ্রেস যে দাঁড়ায় না — এ কি এমনি এমনি? মালিকদের কাছ থেকে টাকা নিলে মালিকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো যায়? সিপিএম যে নন্দীগ্রামে কেমিকেল হাব করার জন্য মরিয়া এবং তার জন্য কৃষক ও খেতমজুরদের প্রতিবাদের কোনও মূল্য না দিয়ে বারাসত-রায়চক চার লেন রাস্তা তৈরির জন্য জমি কেড়ে নিতে যে উঠেপড়ে লেগেছে, তা বিনা রসদে নয়। মালিকপক্ষ সিপিএমকে টাকা দিয়ে বিদেশে তীব্র প্রতিবাদের মুখে পড়া দূষণ সৃষ্টিকারী মারণশিল্প কেমিকেল হাব নন্দীগ্রামে করে নিতে চাইছে। মালিকরা বিভিন্ন দলকে টাকা দেয় এই কারণেই। কয়েক মাস আগে সংসদে ঘুষকাণ্ড নিয়ে হইচই পড়ে গিয়েছিল। কয়েকজন শিল্পপতি তাদের স্বার্থে সংসদে কিছু প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য সাংসদদের ঘুষ দিয়েছিল। এটা অন্যায় নয়, কেউ সেদিন বলেনি। সকলেই নিন্দে করেছিল। তাহলে ভোটের আগে টাকা নিলে সেটা কী করে ন্যায় হয়? যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি, যাদের জনস্বার্থে কাজ করার কথা, তারা যদি মালিকদের টাকা নিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করে, তাহলে সেটা কি অন্যায় নয়? জনগণের প্রতি প্রতারণা নয়? ফলে তরুণ গগৈ যখন বলেন, পুঁজিপতিদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ায় অন্যায় কোথায়, তখন বোঝা যায়, তাঁর এই ন্যায় অন্যায়ের ধারণা শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষের স্বার্থের নিরিখে ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা নয়, তাঁর ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা মালিকশ্রেণীর স্বার্থের নিরিখে গড়ে ওঠা ধারণা।

বুর্জোয়া দল হিসাবে কংগ্রেস-বিজেপি মালিকশ্রেণীর টাকায় লালিত-পালিত। সিপিএমও তার বামপন্থী চরিত্র যত হারাচ্ছে, তত বেশি করে মালিকশ্রেণীর অর্থের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। মাত্র তিন রাজ্যে সিপিএমের শক্তি সীমাবদ্ধ থাকলেও মালিকশ্রেণী সিপিএমকে টাকা দেয় কতকগুলি দিক বিবেচনায়। প্রথমত, সর্বভারতীয় স্তরে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হওয়ায় এবং উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে বিজেপির পক্ষে একক শক্তিতে ক্ষমতায় আসার বাস্তব অবস্থা না থাকায় জোট রাজনীতি বা কেন্দ্রে জোট সরকার গঠন অনিবার্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই জোট সরকার গঠনে সিপিএমের একটা ভূমিকা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বামপন্থী আন্দোলন এবং শ্রমিক আন্দোলনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার ক্ষেত্রে এবং পুঁজিবাদী শোষণ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বুর্জোয়া দলগুলির চাইতে সিপিএম অনেক বেশি দক্ষ। সেই কারণে মালিকদের কাছে সিপিএমের কদর দিন দিন বাড়ছে। মালিকরা স্বাভাবিকভাবেই সিপিএমকে পাওনার উপর বোনাস দিতে কোনও কার্পণ্যই করছে না।

একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল কখনই এভাবে পুঁজিপতিদের থেকে অর্থ নিতে পারে না। তাহলে তাদের অর্থের উৎস কী? শ্রমিকশ্রেণীর দলের অর্থের উৎস শ্রমজীবী জনগণ। যে জনগণের জন্য পার্টিটি লড়বে, সেই জনগণই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে সংগ্রামী তহবিল পূর্ণ করবে। জনগণ জানবে, এই দলকে সাধ্যমত সাহায্য করা তার নৈতিক কর্তব্য। ভারতের একমাত্র সাম্যবাদী দল এস ইউ সি আই অর্থের জন্য সাধারণ মানুষের উপর নির্ভর করে। রাস্তায়, ঘরে ঘরে মানুষের কাছে হাত পেতে এই দলের কর্মীরা অর্থ সংগ্রহ করে। কেউ কেউ বিদ্রূপ করে বলে, এস ইউ সি আই কৌটো নাড়া পার্টি। বিদ্রূপ করে এ কথা বলা হলেও এ পরিচয় গৌরবেরই।

বর্তমানে নির্বাচন যত বেশি অর্থনির্ভর হয়ে যাচ্ছে, মালিকদের কাছে রাজনৈতিক দলগুলির অর্থের জন্য ছোটাছুটি তত বাড়ছে। স্বাধীনতার পর নমিনেশন ফি যা ছিল, এখন তার ৫০ গুণ বাড়ানো হয়েছে। আগে দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে তুলনামূলকভাবে কম খরচে প্রচারের যে সুযোগ ছিল, নির্বাচনী সংস্কারের নামে সেসব সঙ্কুচিত করা হচ্ছে। পোস্টার মারা, লিফলেট বিলি, মাইক মিটিং করা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রচারকেও নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। নির্বাচনী প্রচারকে করে তোলা হচ্ছে বৈদ্যুতিন মিডিয়া নির্ভর, সংবাদপত্র নির্ভর — যেখানে প্রচার পেতে প্রচুর টাকা দিতে হয়। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, গরিব মানুষের প্রতিনিধিদের নির্বাচন থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া। পার্লামেন্টে গরিব মানুষের সংগ্রামী প্রতিনিধিরা গিয়ে যাতে বুর্জোয়াদের স্বার্থে আনা জনবিরোধী নীতির বিরোধিতা করতে না পারে, সেজন্য নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে এদের দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে বৃহত্তম গণতন্ত্রের নামে। পাশাপাশি অন্যান্য দলগুলিকেও টাকা দিয়ে সেই সমস্ত দলের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বুর্জোয়ারা তাদের পক্ষে কাজ করানোর কৌশল নিয়েছে। পার্লামেন্ট বাস্তবে খোলাখুলি বুর্জোয়াদের ইচ্ছার যন্ত্রে পরিণত হয়েছে। বুর্জোয়া ব্যবস্থার আয়ুষ্কাল যত বাড়ছে, ‘বাই দি পিপল, ফর দি পিপল, অব দি পিপল’ কথাটির তাৎপর্য তত দ্রুত নিঃশেষিত হতে বসেছে। বাস্তবে এখন মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার ও মিডিয়া পাওয়ারই দেশ চালাচ্ছে। এই অবস্থাতে সংসদে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর প্রতিফলিত করার ন্যূনতম যতটুকু সুযোগ আজও অবশিষ্ট আছে, সেটাকেও রক্ষার জন্য গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে এগিয়ে এসে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং নির্বাচনে এমন সব প্রার্থীকে জয়যুক্ত করতে হবে, যারা বুর্জোয়াদের টাকার কাছে বিক্রি হবে না।

তলে তলে ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ হচ্ছে সিপিএম

একের পাতার পর

বলল, উনি ভারত সরকারের অলিখিত রাষ্ট্রদূত। সেই হল শুরু।

এখন জানা যাচ্ছে, আরব দুনিয়ার রক্তমাখা ইজরায়েলি পুঁজি আসবে পশ্চিমবঙ্গে যৌথ উদ্যোগের ভেক ধরে। ইজরায়েলি সংস্থা এলবিট মেডিকেল ইমেজিং সিপিএম ঘনিষ্ঠ হর্ষ নেওটিয়ার বেঙ্গল অম্বুজার সঙ্গে যৌথভাবে ই এম বাইপাসের ধারে ১০০০ শয্যার হাসপাতাল খুলবে নেওটিয়া এলবিট হেলথ সিটি নামে।

এছাড়াও টেলিকম ক্ষেত্রে ইজরায়েলি পুঁজি আনার আগমনী গাইছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকরা। সবটাই চলছে তলে তলে, মুখে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গগনবিদারী চিৎকারের আড়ালে। যাতে জনগণ শুধু নয়, দলের কর্মীরাও ভালোভাবে টের না পায়।

ভোটের আগে প্রতিশ্রুতির ফোয়ারা

ছয়ের পাতার পর

দিয়েছে, তাকে ভোটের প্রচার না বলে টাটার প্রচার বলাই ভালো।

সর্বোপরি প্রশ্ন হল, কর্মসূচিতে যাই বলা থাক, ভোটের পর সি পি এম কী করবে? তারা আন্দোলন করবে না, অশান্তি ঘটাবে না, মালিকশ্রেণীর রাতের ঘুম কাড়তে যাবে না। আবার তারা এককভাবে বা তাদের তৃতীয় ফ্রন্টও ক্ষমতায় আসবে না। ফলে তারা কী করবে? সিপিএম বহছে, কংগ্রেস যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন করার জন্য কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। সেক্ষেত্রে এখন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা যা বলছে, সেসব ফেলা থুথু চাটতে হবে। আর কংগ্রেস যদি সি পি এমকে বাদ দিয়েই সরকার গড়তে পারে, তবে কংগ্রেসের রিজার্ভ বেঞ্চে তাদের বসে থাকতে হবে সুযোগের অপেক্ষায়। কর্মসূচির ঠাঁই হবে ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে, যেমন হয়েছে ইউ পি এ-র ‘কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম’-এর বেলায়।

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

আগামী লোকসভা নির্বাচনের কর্মসূচি ও দাবিসনদ

নির্বাচনের পর এস ইউ সি আই নিম্নলিখিত দাবিগুলির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলবে

১। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যে হারে কমেছে, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল ট্যাক্স প্রত্যাহার করে পেট্রোল, ডিজেল ও কেরোসিনের দাম কমাতে হবে।

২। মজুতদারি-কালোবাজারি কঠোর হাতে দমন করে সকল পণ্যসামগ্রীর দাম কমাতে হবে। পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সুলভ মূল্যে সরকারি বিতরণ ব্যবস্থা মারফৎ নিয়মিত সরবরাহ করতে হবে।

৩। সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যয়বরাদ্দ কমিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

৪। সকল অগণতান্ত্রিক কালা আইন বাতিল করতে হবে। বিনা বিচারে আটক করা বন্ধ করতে হবে। বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমনে পুলিশ-মিলিটারীর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে।

৫। জোর করে কৃষিজমি দখল ও ধ্বংস করা বন্ধ করতে হবে। প্রধানত অকৃষি জমিতে শিল্প স্থাপনের নীতি অনুসরণ করতে হবে। সেজ (SEZ) বাতিল করতে হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণে ও খরার স্থায়ী সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। নদী-উপনদী-খাল-বিল সংস্কার ও দূষণমুক্ত করতে হবে। ব্লকস্তরে সর্বত্র ড্যাম বা জলাধার তৈরি করে ব্যাপক সেচের ব্যবস্থা করতে হবে এবং ভূগর্ভস্থ জল সেচকার্যে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

৬। গরিব কৃষকদের ঋণমুক্ত করতে হবে, সুদখোরি মহাজনী প্রথার অবসান ঘটিয়ে বিনাসুদে দীর্ঘমেয়াদী সরকারি ঋণ দিতে হবে। ল্যান্ড সিলিং তুলে দেওয়া বন্ধ করতে হবে। পর্যাপ্ত ভরতুকি দিয়ে স্বল্পমূল্যে সার-বীজ-কীটনাশক ঔষধ-বিদ্যুৎ-ডিজেল কৃষকদের সরবরাহ করতে হবে। পাইকারি ব্যবসার বিলোপ ঘটিয়ে সরকারকে ন্যায্য দামে কৃষকদের কাছ থেকে ফসল কিনতে হবে।

৭। সকল গ্রামে পানীয় জল, বিদ্যুৎ, প্রাইমারি বিদ্যালয়, রাস্তা নির্মাণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ মজুরদের সারা বছর স্থায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরি দিতে হবে।

৮। বি পি এল লিস্টের কারচুপি ও রেশনিংয়ের দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৯। সকল বন্ধ কারখানা খুলতে হবে, ছাঁটাই শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বহাল করতে হবে। নতুন কলকারখানা খুলতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চাকরির পদ অবলুপ্তি বন্ধ করে সকল খালি পদে নতুন নিয়োগ করতে হবে। সরকারি বেসরকারি স্তরে কর্মী নিয়োগে কন্ট্রাক্ট প্রথার অবসান ঘটিয়ে সকলকে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করতে হবে। বেসরকারীকরণ ও বিলগ্নীকরণ বন্ধ করতে হবে। ইতিমধ্যে বেসরকারীকরণ করা শিল্পগুলিকে পুনরায় সরকারি মালিকানায় ফিরিয়ে আনতে হবে। কর্ম নিযুক্তির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। রুগ্ন লেবেল লাগিয়ে কোনও কারখানা বন্ধ করায় সরকার কোনও সহায়ক ভূমিকা নেবে না, কোনও সাহায্য দেবে না, দরকার হলে সরকারকে সেগুলি অধিগ্রহণ করতে হবে।

১০। মধ্যবিত্ত জনগণের ওপর সম্পত্তি কর এবং আয়করের বোঝা বাড়ানো চলবে না।

১১। ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্পে সুদের হার বাড়াতে হবে।

১২। কাজের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি দিতে হবে। সকল কর্মক্ষম নারী-পুরুষকে যোগ্যতা অনুযায়ী স্থায়ী কাজ ও ন্যায্য মজুরি দিতে হবে, যতক্ষণ না দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ উপযুক্ত বেকারভাতা দিতে হবে।

১৩। অবৈতনিক শিক্ষার অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। শিক্ষা সংহারক 'নলেজ কমিশনে'র সিদ্ধান্ত বাতিল করে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ এবং ব্যয়বৃদ্ধি বন্ধ করতে হবে। সার্বজনীন গণতান্ত্রিক, সেকুলার, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা চালু করতে হবে। সেক্স এডুকেশন বন্ধ করতে হবে। গ্রেডেশন প্রথা বন্ধ করে পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

১৪। স্বাস্থ্যপরিষেবার ব্যবসায়ীকরণ বন্ধ করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের উদ্যোগে সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে ও শহরে আধুনিক এবং সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত সহ হাসপাতাল স্থাপন করতে হবে। সকল জীবনদায়ী ঔষধের দাম কমাতে হবে।

১৫। পণপ্রথা, বধূহত্যা, কন্যাভ্রূণ হত্যা, নারী নির্যাতন, নারীপাচার কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

১৬। অশ্লীল পুস্তক, সিনেমা, নাটক, বিজ্ঞাপনের প্রচার ও প্রসার শক্ত হাতে বন্ধ করতে হবে।

১৭। মদ, ড্রাগ সহ সমস্ত নেশাযুক্ত জিনিসের প্রাদুর্ভাব শক্ত হতে রুখতে হবে।

১৮। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী গ্লোবালাইজেশন প্রক্রিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ সমস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে কোনও ধরনের গাঁটছাড়া বাঁধা চলবে না এবং সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বব্যাপী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক, অসামরিক এবং যৌথ মহড়া চুক্তি বাতিল করতে হবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে অবিলম্বে ইরাক ও আফগানিস্থান ছেড়ে চলে যেতে হবে।

১৯। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐক্য ধ্বংস ও ভোটব্যাঙ্ক তৈরির হীন স্বার্থে ধর্ম-জাতপাত-উপজাতীয়-জনজাতিগত বিরোধ সৃষ্টি ও উস্কানি দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

২০। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

২১। চূড়ান্ত স্বৈরাচারী সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

২২। আমলাতন্ত্রের দাপট কমাতে হবে এবং প্রশাসনের সমস্ত স্তর থেকে দুর্নীতি নির্মূল করতে হবে।

২৩। প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন করতে হবে।

২৪। বিচার ব্যবস্থার সর্বস্তরে সুলভ, নিরপেক্ষ এবং দ্রুত ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২৫। বিদেশে, ব্যাঙ্কে গচ্ছিত কালো টাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সঞ্চিত সমস্ত কালো টাকা খুঁজে বার করতে হবে ও বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

লন্ডনে জি-২০ শিখর সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণিরা সমবেত হয়েছিল
মন্দা কাটানোর জন্য নতুন আক্রমণ শানাতে। পুঁজিবাদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ

ভগৎ সিং-এর আত্মদান দিবস উদযাপিত

শহীদ ভগৎ সিং-এর আত্মদান দিবস উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে ২২ মার্চ হাওড়ার ঘোড়াঘাটা বাজারে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শহিদ ভগৎ সিং প্রসঙ্গে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন সকালে নবাসন ফুটবল মাঠে চারটি দলের এক প্রীতি ফুটবল ম্যাচও অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট প্রাক্তন শিক্ষক শ্রীকান্ত জানা। ভগৎ সিং-এর জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা চণ্ডীচরণ মাইতি। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করেন সংগঠনের হাওড়া জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড প্রদীপ মণ্ডল ও সম্পাদক কমরেড নিখিলরঞ্জন বেরা। বিজয়ী ও বিজিত দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন এস ইউ সি আই বাগনান লোকাল কমিটির সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকার। সব শেষে বাগনান নাট্যগোষ্ঠী পরিবেশিত 'লাশ বিপণিতে ওরা জাগছে' নাটকটি উপস্থিত দর্শকদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে।

শহিদ-ই-আজম ভগৎ সিং মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষ থেকে আগামি বছর হাওড়া শহরের কাজীপাড়ায় অমর শহিদের মূর্তি স্থাপন করা হবে। এ বছর ২৩ মার্চ ফাঁসির সময় ঠিক সন্ধ্যা ৭টায় ঐ স্থানে শহিদবেদিতে মাল্যদান করা হয়। তার আগে ছাত্র-যুব-নাগরিকদের মোমবাতি এবং মশাল সহযোগে একটি সুদৃশ্য মিছিল জিটি রোড হয়ে কাজীপাড়ায় পৌঁছায়। মিছিলের মশালটিতে অগ্নিসংযোগ করেন কমিটির সহসভাপতি বিখ্যাত উর্দু কবি জনাব কইসর শামিমজি। কাজীপাড়া মোড়ে মশালে অগ্নিসংযোগ করেন কমিটির সভাপতি হিন্দি কবি পাষাণজি। এছাড়া হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অনিল চ্যাটার্জী, প্রখ্যাত ফুটবলার অমরনাথ দে সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন। শেষে একটি সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

কাকদ্বীপে মাস্টারদা ও ভগৎ সিং-এর শহিদদিবস পালন

কাকদ্বীপ ইউথ কালচারাল ফোরামের পক্ষ থেকে ২৩ মার্চ মাস্টারদা সূর্য সেন এবং ভগৎ সিং-এর আত্মোৎসর্গ দিবস পালিত হল নেতাজী সংঘের মাঠে। এই উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক মুরারীমোহন দেবনাথ। বিশেষ অতিথি ছিলেন খগেশ চন্দ্র দাস ও প্রধান বক্তা ছিলেন 'সারা বাংলা নেতাজী জন্ম শতবার্ষিকী কমিটি'র অন্যতম সদস্য অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। তিনি মাস্টারদা এবং ভগৎ সিংয়ের বৈপ্লবিক জীবন ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরে এক মনোগ্রাহী আলোচনা করেন। ভগৎ সিংয়ের একটি চিঠি পাঠ করেন ফোরামের কোষাধ্যক্ষ অমৃত বাগ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন ফোরামের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক রামচন্দ্র সাহু। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ফোরামের সভাপতি শিক্ষক ঝন্টু মাইতি।

জয়নগর (তপ:) লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত এস ইউ সি আই প্রার্থী
ডাঃ তরুণ মণ্ডলের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার মিছিল

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in